Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সম্পাদকীয় ১
ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনই রাজ্যকে বাঁচাতে পারে ১
দেশে-বিদেশে ২
ভারতে চে গ্যেভারা ৩
বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বৈরাচারী ও পঠনপাঠনের পরিবেশ ধ্বংসে সক্রিয় ৪
যে উন্নয়নে ৯৯ শতাংশ মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকা দায় ৫
কলকাতায় 'চে' দুহিতা ৬
পুঁজিবাদের বিবর্তন (১) ৭
নেতাজীর জন্মদিনে দেশপ্রেম দিবস উদযাপন ৮

70th Year 23rd Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 28th January 2023

সম্পাদকীয়

লেনিনবাদী দৃষ্টিতে আপস

ভারতের শাসনক্ষমতায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিচালিত বিজেপি। আর যেকোনো কারণেই হোক, রাহুল গান্ধির ভারতজোড়ো যাত্রা বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের আগ্রাসনের চিত্রটি নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় মাত্রায় উন্মোচিত করতে পেরেছে। বামপন্থীরা এই আন্দোলনকে সমর্থনের প্রশ্নে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। প্রসঙ্গত রুশ বিপ্লবকালে কর্নিলভ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি কেরিনেস্কি সরকারের সঙ্গে, বিপ্লবের মাত্র ছ মাস আগে আপসের প্রশ্নে কমরেড লেনিন দলীয় পত্রিকায় লিখলেন : ''রাজনীতিতে আপসের অর্থ কোনো পক্ষের কাছে কিছু দাবি ছেড়ে সাময়িক সহাবস্থানের শর্ত মেনে নেওয়া। আজ সমস্ত পত্রপত্রিকায় শোরগোল উঠেছে বলশেভিকরা কখনো আপস করে না। এতে আমাদের বিপ্লবী সত্তা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কথা। ওদিকে আমাদের অদম্য মনোভাবের জন্য বুর্জোয়া দলগুলি খুবই উল্লসিত। সমাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে তারাও অতিরিক্ত সচেতন।'' তা সত্ত্বেও এঙ্গেলস থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তিনি এই সব উগ্র আপসবিরোধী ব্ল্যাঁকিবাদীদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, বাধ্যতামূলক ভাবেই বিপ্লবের আদর্শে প্রত্যয়ী থেকেও রণকৌশলের স্বার্থে আপস করতে হয়।'' লেনিন ১৯০৫-০৬ ব্যর্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তীকালে স্টলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময় ডুমায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের কিছু দাবি ত্যাগের কথা বলেছেন। আর কর্নিলভ প্রতিক্রিয়ার সময় আপস করার জন্য শ্রমিকদের সশস্ত্র করার সুযোগ পেয়েছেন। হতাশাগ্রস্ত দল ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে আশার ঢেউ জাগাতে পেরেছিলেন। আজ তাই এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের অক্ষ করে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মঞ্চ গঠনের লক্ষ্যে রাহুল গান্ধি বা কংগ্রেসের এই দীর্ঘ পদযাত্রার গণতান্ত্রিক উপাদানগুলোকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। হোক না তা এক ধরনের কম্প্রোমাইজ।

বাস্তবে যে দাবিগুলি এই দীর্ঘ পদযাত্রায় উত্থাপিত হয়েছে তার মূল্য যে অপূরণীয় তা, স্বীকার করতেই হবে। অন্য কোনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি কিছুটা অন্তরালেই পড়েছিল। এমন সুসংহতভাবে সাধারণ জনসমাজের কাছে এগুলি তুলে ধরা যায়নি।

এই সুগভীর বিষয়টির তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করা বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থবাহী। জাতীয় কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখেও এই বাস্তবতাকে আপাতত স্বীকার করেই বামপন্থীদের সম্যক ভূমিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বিজেপির মূল লক্ষ্য এদেশের বুকে অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের পদানত করে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান নির্মাণ। এই লক্ষ্য পূরণে সমস্ত প্রতিবাদী ও ভিন্নমতের কণ্ঠ রুদ্ধ করে আধিপত্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা। দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যমগুলিকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সমস্ত কর্মসূচিগুলির জয়গান করা। বস্তুত গণমাধ্যমগুলিকে বশ করার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করে কিনে নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান দিক ভিন্নমতের অবাধ প্রকাশ। তা বর্তমানে পূর্ণত স্তব্ধ করে বিকৃত করা হচ্ছে। কোনো এক বাণিজ্যিক ছবির প্রচার বন্ধ করতে সরকারি মদতে তাণ্ডব চালানো হল। তার ফল অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই সেই চলচ্চিত্রটির বিপুল বাণিজ্যিক সাফল্য। একইসঙ্গে লক্ষ করা যায় যে, বি বি সি প্রযোজিত একটি তথ্যচিত্রে নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উগ্র হিন্দুত্ব আশ্রয়ী গণহত্যার সংঘটনে প্রত্যক্ষ যোগ দেখানোর জন্য সেই তথ্যচিত্রটি ভারতে প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া। ছবিটি ভারতে কার্যত নিষিদ্ধ এবং বেআইনি বলে ঘোষিত। টাইমসের সংবাদ ভাষ্যকার মার্কিনটায়ার এই ঘটনার সূত্রে জানা যায় যে, অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট-এর মতো চিরায়ত যুদ্ধ ও হিংসা বিরোধী ছবিও বন্ধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক পুঁজিব্যবস্থার চরম সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে হিটলার ফ্যাসিবাদী তান্ডবের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানকালে বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট প্রবলতর। ভারতের শাসক দল এবং বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নিয়েছেন ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন জীবিকার চূড়ান্ত সমস্যা সৃষ্টি করে হলেও বিশ্বপুঁজিব্যবস্থার সংকট মোচনে ভূমিকা গ্রহণ করার। এমন মনে হওয়া অমূলক নয় যে, আমাদের দেশের বামপন্থী দলগুলি সম্মিলিত বা এককভাবে এই সর্বগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের ব্যাপক আক্রমণের আড়ালে কতিপয় ধনকুবেরের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তেমন সদর্থক কোনও ভূমিকা নিতে পারছে না। তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুলে এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে কর্মসূচি নিতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে কোনও প্রাথমিক আলোচনাও অদ্যাবধি অনুপস্থিত। বামপন্থীদের এই সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয় অপ্রিয় হলেও অনস্বীকার্য। বাস্তবে অনতিদূর অতীতে জাতীয় স্তরের উদার গণতান্ত্রিক বুজোয়া দল চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত ধনবাদের স্বার্থে এক কট্টর ফ্যাসিবাদী দলের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ অশেষ বিপদে ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনই রাজ্যকে বাঁচাতে পারে

পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজ জাতি বর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষভাবেই অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। এই রাজ্যের আর্থ রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই দ্রুত অধোগতি সকলেই অনুভব করতে পারছেন। প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, কারা এই রাজ্যের সর্বনাশ করে চলেছে। সর্বনাশ তো শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন দামবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের বা পেট্রল ডিজেলের দামবৃদ্ধির প্রশ্নেই নয়, এসব ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারের অবশ্যই ভূমিকা রয়েছে। তাহলেও এককভাবে রাজ্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। এই বোধটি মমতা ব্যানার্জী সরকারের বিশেষ সুবিধা। তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অস্বাভাবিক চাপ কিছুটা কমাতে পারতো না, এমন তো অবশ্যই নয়।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি অন্যত্র। মনে করা যেতেই পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি যে ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিল, তা তুলনাহীন। সাধারণ মানুষকে একের পর এক ধোঁকা দিয়ে প্রতিদিন মিথ্যা কথার আসর বসিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জী স্বয়ং। কে না জানে যে, নির্বাচনী প্রচার সভাগুলিতে তৃণমূল নেত্রী মঞ্চের ওপর অজস্র ফাইল জড়ো করে সমবেত শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, এইসব ফাইলে বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের লাগামহীন দুর্নীতির তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। তিনি রাজ্য সরকার গঠন করলে এসব নিয়ে তদন্ত করবেন। জেলে পুরবেন অভিযুক্তদের। হয়তো অনেকেই এমন সব সম্পূর্ণ বা নির্জলা মিথ্যায় বিশ্বাস করেছিলেন। যেখানে তিনি নির্বাচনী প্রচারে গেছেন সর্বত্রই এমন সব দুর্নীতির কল্পকথা শোনাতেন এবং বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন।

কৌতুককর, এতগুলি বছরে বামফ্রন্ট আমলের একজন মন্ত্রী মায় বিধায়ক বা সাংসদের বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগও মমতা ব্যানার্জী তুলতে পারেন নি। বারো বছর সময়কালে তিনি চেষ্টা করেও কিছু মাত্র এগোতে পারেননি। তিনি সেই সময়ে সততার প্রতীক বলে নিজেকে জাহির করতেন। রাজ্যের নামী দামী গণমাধ্যমগুলি অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিল মমতা ব্যানার্জীর। বিপুল পরিমাণে টাকা পয়সা খরচ করে মিডিয়া কর্তাদের তিনি একান্ত পোষ্য হিসেবেই ব্যবহার করে গেছেন। তখন তো তাঁর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জীবন যাপনের বিষয়ও টিভির পর্দায় অবিরত দেখা যেত। তিনি কোচরে করে শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছেন বা সামান্য কিছু খাবার খাচ্ছেন তা-ও দেখানো হত। অর্থাৎ, তাঁকে দেশের জন্য সমর্পিত প্রাণ এবং অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক মহান নেত্রী বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রচার চলেছে নিশিদিন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এত অর্থ তিনি পেলেন কোথায়? শুধুমাত্র সারদা-রোজভ্যালির মতো লোকঠকানো চিটফান্ডের টাকায় তো এত দেদার খরচ সম্ভব নয়!

একই সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক জগতের বহু দলকে সম্মিলিত করে এক রামধনু জোট নির্মিত হয়েছিল। কে না ছিল সেই জোটে? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে এস ইউ সি আই-এর মতো আগমার্কা বাম দল, নকশালবাদী নানা গোষ্ঠী, বিজেপি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এবং মুখ্যত সি পি আই (এম) এর বিরোধিতা করা প্রায় সকলেই কেই জোটে সামিল। দুর্ভাগ্য বাংলার, বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য মানুষরা এমন মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পড়ে মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামিল হয়েছিলেন। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ বামপন্থী চিন্তাভাবনায় যুক্ত থাকা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের যাপিত মূল্যবোধ ও চেতনাকে অস্বীকার করে উগ্র বাম বিরোধিতায় মেতে উঠেছিলেন। অনেক পুরোনো ইতিহাস নয়। অনেকেরই স্মরণে থাকা উচিত যে, তৃণমূল কংগ্রেস নামক একটি নামে রাজনৈতিক দল বাস্তবে, পারিবারিক ব্যবসার স্বরূপ অনেকেই ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে বিফল হয়েছিলেন। এখন হয়তো মনে মনে বিলাপ করেন। প্রকাশ্যে বলতে আর সাহস পান না।

এই ইতিহাস তো চলমান বা প্রবহমান। সত্যিই তো, গণতন্ত্রের প্রশ্নে মুখ্য বামপন্থী দলগুলির পৃথক ভাবাদর্শ রয়েছে. মার্কসবাদী চিন্তায় এদেশে প্রচলিত গণতন্ত্র তো দেশ-বিদেশের বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্য বজায় রাখার এক অপপ্রয়াস ভিন্ন কিছু নয়। এই গণতন্ত্র একটি ভাঁওতা দেবার মুখোশ মাত্র। বামপন্থীরা মনে করেন যে, গণতন্ত্রকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, সসম্মান জীবন ধারণের অস্ত্র হিসেবে আরও সঠিকভাবে, আরও ব্যাপ্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। জনগণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্র কোনভাবেই নিশ্চিত করে না। দেশের শ্রমকারী মানুষদের প্রবঞ্চিত করে তাঁদের জীবনযন্ত্রণা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবার ছল করে এই চলমান সংসদীয় গণতন্ত্র।

মার্কসবাদীরা রণকৌশল হিসেবে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বুর্জোয়া শোষণ ও বঞ্চনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়। সে কারণেই মার্কসবাদীরা সংসদের মধ্যে এবং বাইরে একযোগে লড়াই চালিয়ে যেতে দায়বদ্ধ। বামপন্থীদের লক্ষ্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে জাতি ধর্ম বর্ণ ও ভাষা নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক মানুষের অপার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যেই বামপন্থীদের পথ চলা।

আর সংখ্যাধিক মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে অতি অল্প সংখ্যক সম্পন্ন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মালিকানা দখল করা মুনাফানির্ভর পুঁজিমালিকদের শোষণ বঞ্চনার সুচারু ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য তাদের পক্ষ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের মুখোশ ব্যবহার করে তঞ্চকতার রাজত্ব কায়েম করে। এই দুই ধারার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। মহান মানবিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কার্ল মার্কস এই সংঘাতকেই শ্রেণি সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছিলেন যে মানুষের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।

মমতা ব্যানার্জীর মতো রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করে অল্প সংখ্যক মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারীরা প্রচলিত গণতন্ত্রের জয়গান করেন। বামপন্থীদের গণতন্ত্র বিরোধী বলে জনসমাজে মিথ্যা প্রচার করে গেছেন মমতা ব্যানার্জীর মতো পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক বা পোষা বাকসর্বস্ব দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিরা।

সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী মমতা ব্যানার্জী রাজ্য বিধানসভাকে গণতন্ত্রের পীঠস্থান এবং পবিত্র স্থান বলে মনে করেন। সেই বিধানসভাই নির্বিচারে আক্রান্ত হয়। স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী বিধানসভার মধ্যে হানা দিয়ে ইচ্ছেসুখে ভাঙচুর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর তথাকথিত আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন! তাঁর সঙ্গে সেদিন সন্ধেবেলায় বাছাই করা তৃণমূলী সমাজ বিরোধীরা তাঁরই নির্দেশে বিধানসভার ইতিহাসে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছিল। এরপর ৮ পাতায়

বেলগাঁওয়ের যুদ্ধ

নানা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগত সংস্কৃতি উপেক্ষা করে তীব্র ভাষাগত যুদ্ধের উন্মাদনাই বেলগাঁওয়ের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির মূল কারণ। মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকের রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থই জন্ম দিয়েছে বেলগাঁও বিতর্কের। এই দুই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা না করে আগুনে ঘি ঢেলেই চলেছে। মুম্বাই ও বেঙ্গালুরু সরকার ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কর্নাটক একজন সাংসদ সহ মহারাষ্ট্রের কয়েকজন রাজনীতিককে বেলগাঁওয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি। এঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। ফলে ঐ অঞ্চলে এক হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকের বিধানসভা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে চলেছে।

আসলে বেলগাঁওয়ে মারাঠা ভাষী মানুষের সংখ্যা প্রচুর বলেই মহারাষ্ট্র সরকারের এমন দাবি, ১৯৬০ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণের সময় তদানীন্তন মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বেলগাঁও কর্নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেই সময় থেকে বেলগাঁও এবং সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি মহারাষ্ট্র জানালেও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মেহের চাঁদ মহাজনের নেতৃত্বে মহাজন কমিশন কর্নাটকের পক্ষেই রায় দেয় এবং বেলগাঁও কর্নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাষা নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সেই সময় থেকেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে, কখনও বেশি, কখনও কম। ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের সীমানা পুনর্নির্ধারণের সময় (Linguistic State) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এমন ঘটনা নয়। প্রতিবেশী দুটি রাজ্যের সমৃদ্ধ সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য আরও উন্নত হওয়ার বড় কারণ দুই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে অবাধ সংমিশ্রণ, এবং এর বলে ভাষা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে, আজ যারা ভাষা নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে, তারা ইতিহাস এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ। দেশের সংহতির বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে এমন দুষ্কর্ম করে চলেছে। সামূহিক নেতৃত্বে পরিচালিত জাগ্রত জনগণই এর প্রতিরোধ করতে পারে।

বোলসোনারোর মদতপুষ্ট দাঙ্গাবাজদের ব্রাজিলের সরকারি বাসভবন, অফিস, আদালতের উপর হামলা

ব্রাসিলিয়া :— নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হঠাতে হবে। দেশে সেনাশাসন চালু করতে হবে। এমনই সব উদ্ভট দাবিতে ব্রেজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর সমর্থক অতি দক্ষিণপন্থী দাঙ্গাবাজদের তাণ্ডব চলেছে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর। সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংসের অভিযোগও আছে বোলসোনেরোর অনুগত দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে। স্পেন সহ বিশ্বের একাধিক দেশ দক্ষিণপন্থীদের এই তাণ্ডবের নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে। এদিকে বোলসোনারোর অনুগত দাঙ্গাবাজদের হামলার প্রতিবাদে দেশের নানা প্রান্তে প্রেসিডেন্ট লুলার সমর্থকরা রাস্তায় নেমেছেন। ইতিমধ্যে নিজের দেশ ব্রাজিলে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও ব্রাজিলের বর্তমান সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন দেখে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন স্বৈরচারী প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো ফ্লোরিডার এক হাসাপাতালে অসুস্থতার অজুহাতে ভর্তি হয়েছেন। তবে তাঁকে আমেরিকায় থাকায় অনুমতি দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। বাইডেন প্রশাসনের অন্দরমহলে বাইডেন প্রশাসন লুলা বিরোধী হামলার কড়া সমালোচনা করেছে। সম্ভবত লুলার সমর্থকদের প্রতিবাদ আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেই বাইডেন প্রশাসন বোলসোনারোর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। বোলসোনারো-কে আমেরিকায় থাকতে দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কি একমাত্র খেলোয়াড়!

এমন ভাবনা সম্ভবত সঠিক নয়, আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনী যুদ্ধের ময়দানে বিজেপি'ই বাজিমাৎ করবে, আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা চূড়ান্ত ফল নির্ধারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সংবাদমাধ্যমের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোবেল জয়ী এবং প্রখ্যাত চিন্তাবিদ অমর্ত্য সেন এমন কথাই বলেছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি সহ ডি এম কে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এই দলগুলি প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে প্রসঙ্গত অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেন মমতা ব্যানার্জীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা থাকলেও বিজেপি'র বিরুদ্ধে জনরোষকে সংহত করতে পারেন কিনা তা দেখতে হবে। মন্তব্য নিষ্প্রোয়জন। অমর্ত্য সেনের দেওয়া শংসাপত্রে মমতা ব্যানার্জী মহা উল্লসিত।

ঘৃণা ভাষণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়

সম্প্রতি ঘৃণা ভাষণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেও, ঘৃণাভাষণে অভিযুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার কাজটা বাস্তবায়িত না হলে প্রকৃত অবস্থার বিশেষ কোনও তারতম্য হবে না, সারা দেশে বিভেদপন্থীদের দমিয়ে রাখা যাবে না। ক্ষমতাসীন বিজেপির নির্বাচনী রাজনীতিতে হিন্দুভারত নির্মাণের এজেন্ডাকে যেভাবে সামনে নিয়ে এসেছে তাতে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হবেই। সংবাদ মাধ্যমের কঠোর থেকে কঠোরতর নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করে জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের ভূমিকাকে অপ্রাসঙ্গিক করার অপচেষ্টা করছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর এস এসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এস এস-এর কলঙ্কিত ইতিহাসকে ধামা চাপা দেওয়ার লক্ষ্যে সর্দার প্যাটেলের ভাবমূর্তিকে বিজেপি'র অনুকূলে নির্মাণের জন্য বিজেপি কেন তৎপর হয়ে উঠেছে তা বুঝতে অসুবিধে নেই। কৌতুককর ঘটনাই বলতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা অস্বীকার করা অসম্ভব বলে গান্ধীকে লোক দেখানো স্বীকৃতি দিলেও তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী নাথুরাম গডসের ভূমিকা সম্পর্কে বিজেপি নীরব রয়েছে। অসহ্য সীমাহীন দ্বিচারিতা বিজেপি'র মজ্জাগত চরিত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিজেপি'র কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য কুমীরের কান্না হাস্যকর। আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা বিজেপি পালন করতে পারেনি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত কাশ্মীর ফাইলস্ ছবি নিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার বিজেপি রাজনৈতিক রণনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র নির্বাচনী জয়ের লক্ষ্যে ঘৃণা সংস্কৃতির বিষ সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে বিজেপি তৎপর। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বিজেপি'র বাণী তারা যেন মুঘল আমলে সৃষ্ট ক্রীতদাসের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রচারের নমুনা থেকে মনে হয় যেন বিষয়টি এখনও খুবই প্রাসঙ্গিক। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাকি অতীতের অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নির্বাচনী জয়ের জন্য দেশের ঐক্য সংহতিকে বিপন্ন করার এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতেই হবে। পাশাপাশি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ এবং ঘৃণা ভাষণও সমান তালে চলছে, উদ্দেশ্য একটাই--- হিন্দু ভারত নির্মাণ এবং ক্ষমতার আসনটি চিরস্থায়ী করা।

ট্রাম্প মডেল

ব্রাজিলে নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বোলসোনারোর অনুগত দাঙ্গাবাজদের তাণ্ডব প্রায় দু'বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মদতপুষ্ট দাঙ্গাবাজদের দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গার মতই ব্রাজিলের সংগঠিত দাঙ্গাও চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখায় কিভাবে গণতন্ত্রে অন্তর্ঘাত করা সম্ভব। হয়ত এমন ঘটনাই আগামী দিনে 'ট্রাম্প মডেল' বলে মানুষ স্মরণ করবে। রাষ্ট্রপতি ভবন, শীর্ষ আদালত ভবন এবং আরও বেশ কয়েকটি ক্ষমতার কেন্দ্রে বোলসোনারো অনুগত দাঙ্গাবাজরা লুলা দ্য সিলভা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হামলা চালায়– মোদ্দা কথা নির্বাচনী লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পর গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী 'পরাজয়'কে সহজভাবে মেনে নিতে ব্যর্থতার জন্যই নয়া ফ্যাসিস্টদের এই সংগঠিত আক্রমণ গণতন্ত্রের পীঠস্থান অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই ব্রাজিলেও সংগঠিত হয়েছে। এমন ঘটনা প্রমাণ করে ফ্যাসিবাদের ভাইরাস এত সহজে নির্মূল হয় না। ঘুরেফিরে তার আবির্ভাব ঘটে। ব্রাজিলের ট্রাম্প মডেল সংগঠিত হয়েছে। ভারত সহ অন্যান্য দেশেও এমন কাণ্ড ঘটবে না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। ট্রাম্পের মতোই বোলসোনারোও নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন, উদ্দেশ্য একটাই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেওয়া যাতে ফ্যাসিবাদী দুষ্কৃতীদের ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব হতে পারে বোলসোনারো অবশ্য এমন দাঙ্গার ঘটনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখর চেষ্টা করলেও দাঙ্গাবাজদের নিন্দা করতেও তাঁকে শোনা যায় নি।

চিনে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সর্বশেষ তথ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে চিনের কাছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সাম্প্রতিক তথ্যাবলি প্রকাশের জন্য আবেদন করার পর চিন সরকারের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গিয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে বর্তমান সময়কালের মধ্যে চিনে আনুমানিক ৬০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য চিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ থেকে সরাসরি ৫৫০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, কোভিড সংক্রমণের পর হৃদরোগ এবং অন্যান্য কারণে ৫৪,৪৩৫ জন মানুষ ডিসেম্বর ৮ থেকে জানুয়ারি ১২-এর মধ্যে মারা গিয়েছে।

গত ডিসেম্বরে চিনে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ তীব্র হয়ে উঠেছিল। গণরোষের চাপে চিন সরকার হঠাৎ কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধর সব বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর চিনে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সারা বিশ্ব বিশেষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশে চিন থেকে আগত যাত্রীদের উপর নতুন করে বিধিনিষেধের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। চিন থেকে প্রকাশিত কোভিড সম্পর্কিত তথ্যবলি জানার পর বিশ্বস্বাস্থ্য চিন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ভারতে চে গ্যেভারা

মনোজ ভট্টাচার্য

(এক)

১৯৫৯ এর ১ জানুয়ারি ক্যারিবিয় সাগরের ওপর ভাসমান দ্বীপরাষ্ট্র কিউবার বিপ্লব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক স্বৈরাচারী একনায়ক ফালগানশিও বাতিস্তার অপশাসনের অবসান। সমাজতান্ত্রিক কিউবা গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর ফিদেল কাস্ত্রো রুজ, রাউল কাস্ত্রো, ডা. আর্নেস্টো গ্যেভার লা দে সেরনার মতো যুব বয়সী বিপ্লবী নেতৃত্ব। দিগন্তবিস্তৃত অনাচার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চূড়ান্ত এক দৃষ্টান্ত কিউবা সহ লাতিন আমেরিকার সবকটি দেশ। বঞ্চনা, নিপীড়ন কথায় কথায় অপরাধ জগতের নৃশংস অধিপতিরা চোখের পলক পড়ার আগেই অসহায় মানুষকে হত্যা করে। তরুণ ও যুবকদের ছন্নছাড়া জীবনের ঘোর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে অবলীলায়। আর তরুণী ও যুবতীদের দেহপোজীবিনীতে অবনমিত করে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের চরম আধিপত্যমূলক শাসন-শোষণ ব্যবস্থার এটাই সাধারণ দস্তুর। কোনও অন্যথা হয় না।

কিউবার রাজধানী শহর হাভানা ছিল সেই সময়কালে অর্থাৎ, ফিদেল-রাউল-ডা. গ্যেভারার অসমসাহসী বা দুঃসাহসী বিপ্লব অভিযানের আগে মার্কিন মুলুকের কোটিপতিদের লাগামছাড়া বেলেল্লাপনার নিশ্চিত ঠিকানা। শিক্ষার কোনও সুচারু ব্যবস্থা নেই। লোকসাধারণের স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও নামগন্ধও নেই। শুধুই ক্রীতদাসের মতো আখের ক্ষেতে বা চুরুট তৈরির জন্য তামাকপাতা চাষের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম—সারাদিন। সামান্যতম গাফিলতি হলেই নিষ্ঠুর চাবুকের আঘাতে পিঠ চিরে রক্তপাত। সেইসব খামারগুলির মালিকানাও মূলত মার্কিন দেশের পুঁজিপতিদের। অকল্পনীয় পশ্চাদপদতা এবং অমানবিক সমাজসংস্কৃতি। বিশালাকার সব ক্যাসিনো বা জুয়ার আড্ডা আর তার সঙ্গেই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও লালসা পূরণ করার অঢেল ব্যবস্থা- সারি সারি গণিকালয়। সভ্যের বর্বর লোভে বারংবার আদিম হিংস্রতার প্রকাশ।

এমন এক দুঃসহ অবস্থা থেকে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর সহযোদ্ধারা। সুদূর পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন প্রায় দিশাহীন। বিপ্লবী গণআন্দোলনের পথ পরিত্যক্ত। পরিবর্তে দীর্ঘকালীন শান্তি ও পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের নিরুপদ্রব সহযোগিতার অলীক স্বপ্নে বিভোর লেনিন নেতৃত্বাধীন অনন্য বিপ্লবের ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্যাসিবাদী হিটলারের জার্মানী, বেনিতো মুসোলিনীর ইতালি এবং জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করে অক্ষশক্তির পরাজয় নিশ্চিত করেছে সোভিয়েত-মার্কিন ও ব্রিটিশ শক্তি।

কিউবার স্বৈরশাসক ফালগানশিও বাতিস্তা মহাযুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক। দেশের অভ্যন্তরে চূড়ান্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী মোর্চায় সামিল। অতএব, কিউবার তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ইতিকর্তব্য স্থির করার পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশ মতো বাতিস্তার বিরোধিতা থেকে শত হস্ত দূরে। ফিদেলের নেতৃত্বে ২৬ জুলাই কমিটির মানকাডা দুর্গ আক্রমণ থেকে শুরু করে বাতিস্তার অপশাসনের বিরোধী এই সব সংগ্রামী যুবকদের হঠকারি বলেই বিবেচনা করছে কিউবার পথভ্রষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি। বিপ্লবী যুদ্ধে সহযোগিতা না করে দূরত্ব বজায় রেখেছে। আর ফিদেল নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে উপেক্ষা করেছে।

কিউবার বিপ্লব এগিয়ে চলেছে দুর্মর বেগে। রোমান্টিকতা অবশ্যই ছিল। ছিল হৃদয় উদ্বেল করা গণমুক্তির শপথ। ফিদেল ও তার সহযোদ্ধারা কারান্তরালে ছিলেন বেশ কিছুকাল। ঐতিহাসিক বিচারের সমাপ্তি ঘটেছিল ফিদেলের অমোঘ উচ্চারণে 'history will absolve us' অর্থাৎ, ইতিহাস আমাদের মুক্তি দেবে। সেই সময়কালে কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। স্বৈরাচারী বাতিস্তা স্বভাব-ভীরু। সাহস পায় নি ফিদেলকে হত্যা করতে। সেই বিচার থেকে অব্যাহতির পরেই ফিদেল তাঁর অসমসাহসী সহযোদ্ধাদের নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মেক্সিকো রাষ্ট্রে। বিপ্লবের অমলিন স্বপ্ন সার্থক করার সাধনায়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক প্রকারান্তরে নিরাপদ মেক্সিকো থেকে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে।

মেক্সিকোতে সেই সময় নিরন্তর সামরিক রণনীতি ও রণকৌশলের নিবিড় অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি চলছিল। সেই সময়েই, ডা. আর্নেস্টো গ্যেভারা দে লা সেরনা নামে এক অত্যুজ্জ্বল আরজেন্টিনীয় যুবক নিজে থেকেই ফিদেল বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। যতদূর জানা যায়, ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মার্কসবাদ লেনিনবাদের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তাঁর ভাই রাউল কাস্ত্রো প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী এবং তাঁর সঙ্গেই ডা. গ্যেভারার প্রাথমিক সংযোগ এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কিউবার বিপ্লব প্রচেষ্টায় গেরিলা যুদ্ধের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। মেক্সিকোয় ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ এর আগেই ডা. গ্যেভারা সমগ্র লাতিন আমেরিকার মানুষদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর মোটর সাইকেল ডায়েরী সাক্ষ্য বহন করে। বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা এবং শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। তারপর 'গ্রানমা' অভিযান। কিউবার উপকূলে পৌঁছে দুর্দমনীয় গেরিলা যুদ্ধ। কৃষক সম্প্রদায় ও শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করে বিপ্লব প্রচেষ্টায় সামিল করা সবকিছুই চলছিল দুরন্ত বেগে। আর এসব কিছুর অন্যতম মুখ্য সংগঠক হয়ে উঠেছিলেন ডা. গ্যেভারা।

মেক্সিকো থেকে বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যেসব বিপ্লবীরা কিউবার মাটিতে পৌঁছেছিলেন তাঁদের অনেকেই মার্কিন মদতপুষ্ট বাতিস্তার সেনাবাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। নতুন নতুন বিপ্লবী যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাহিনীতে সামিল করার অসাধারণ কর্মসূচিতে ডা. গ্যেভারার অবদান সুউচ্চ স্তরে ওঠে। তিনি কিউবা বিপ্লব প্রচেষ্টায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হন। স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক বোধ থেকেই ডা. গ্যেভারা এমন দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনচর্যায় নিবিড়ভাবে এই আদর্শবোধ মিশে ছিল। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব কিউবা বিপ্লবে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। সিয়েরা ময়েস্ত্রা পাহাড়ে যে ভয়াবহ প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বিপ্লবী বাহিনীর বিজয় সম্ভব হয়েছিল তার পিছনেও কমরেড চে'র প্রবাদপ্রতিম অবদান ছিল। ১ জানুয়ারি ১৯৫৯ যখন বিজয়ী বিপ্লবী বাহিনী রাজধানী হাভানায় প্রবেশ করে তখন, দুই বন্ধু ও নেতা 'চে' আর ফিদেল পাশাপাশি। সমবেত হাজার কিউবাবাসীর হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দনে আপ্লুত হয়েছে মরণজয়ী যুদ্ধে জয়ী বিপ্লব।

(দুই)

পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বা জয় করে নতুন কিউবা গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় দুর্মবেগে। সম্মুখ সারিতে ফিদেল 'চে', রাউল প্রমুখ। ফিদেল কাস্ত্রোর পরেই 'চে' গ্যেভারার গুরুত্ব প্রায় রাতারাতি অনুভূত। 'চে' তো বলতেন, 'সমাজতন্ত্রের আসল অর্থ নতুন মানুষ নির্মাণ, যে মানুষের মধ্যে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া বা ফিউদাল সমাজের মনন ও মূল্যবোধ থাকবে না।' সেই মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে উদগ্রীব ডা. 'চে' গ্যেভারা। ক্ষুদ্র দেশটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশ্বের অন্যান্য সমানুভূতিসম্পন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সোভিয়েত দেশের সংশোধনবাদী নীতিগুলি সম্পর্কে চে বিশেষ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কিউবার শিল্প বাণিজ্য বাঁচিয়ে রাখতে প্রথমেই প্রয়োজন অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন।

ভারতে এলেন কমান্দান্তে ডা. গ্যেভারা

পূর্বোক্ত নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত করতে 'চে' ৩০ জুন রাত্রে নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন। তাঁর সহযাত্রী একজন অর্থনীতিবিদ, একজন গাণিতিক, একজন দলীয় কর্মী, এক রেডিও ঘোষক এবং মাত্র একজন নিরাপত্তা কর্মী। তখনও তিনি 'চে' নামে পরিচিত হন নি। দিল্লি বিমানবন্দরে কিউবার এই প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানাতে কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। বিদেশ মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনৈক শ্রী খোসলা উপস্থিত ছিলেন। প্রোটোকল অফিসার হিসেবে। কিউবার এই প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী নেতা এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের বিশেষ সমাদর করে শ্রী খোসলা নিয়ে গেলেন চাণক্যপুরী অঞ্চলে নতুন গড়ে ওঠা অশোক বা অশোকা হোটেলে।

পরের দিনই সকালে প্রায় ৯টা নাগাদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিপ্লবী কমান্দান্তে ডা. গেভেরাকে। তিনমূর্তি ভবনে তাঁর আমন্ত্রণ প্রাতঃরাশে।

পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে গ্যেভারার বেশ দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। নেহরু তাঁকে কমান্দান্তে বলেই সম্বোধন করেছিলেন। কিউবা বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম সম্পর্কে বিশদ খোঁজখবর জানতেন। ডা. গ্যেভারা জওহরলাল নেহরুকে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বহুবিধ বিষয়ে গূঢ় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান পণ্ডিত নেহরুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল বলে জানা যায়। নেহরু বেশ উৎফুল্ল হয়েই কিউবার মুক্তি সংগ্রামের নেতাকে নানাবিধ খাবার খেতে অনুরোধ করেছিলেন। একজন স্নেহশীল রাজনীতিবেত্তা হিসেবেই অনুজ কমান্দান্তের সঙ্গে আলাপচারিতা চলে। জানা যায় যে, 'চে' একসময় নেহরুকে মাও সে তুঙ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চান। নেহরু নাকি কোনও সুস্পষ্ট মতামত না দিয়ে 'চে' গ্যেভারাকে ভারতীয় বিভিন্ন খাদ্যের গুণাবলী নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে কোনও মন্তব্যই পণ্ডিত নেহরু করেননি। বারংবার জিজ্ঞাসা করলেও নেহরু সুকৌশলে তা এড়িয়ে যান। তিনি একসময় নাকি 'চে'-কে বলেছিলেন যে, তাঁর নাতি রাজীব কাশ্মীর থেকে এক ধরনের বিশেষ আপেল কিউবার বিপ্লবীদের জন্য বিশেষভাবে নিয়ে এসেছেন। সন্তানসম স্নেহে তিনি 'চে'র পিঠে হাত রেখে সেই আপেল খেতে বেশ পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু চীন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পেতে 'চে' অসফল হন।

পরের দিন অর্থাৎ, ২ জুলাই দিল্লির বেশ আর্দ্র এবং গরম আবহাওয়ায় 'চে' তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দিল্লির কাছেই ফরিদাবাদ অঞ্চলে গবাদি পশুর খামার বা ডেয়ারি দেখতে যান। একটি লেদ কারখানাও ঘুরে দেখেন। সেই সময় ভারতে শিল্প কারখানা তেমনভাবে উন্নত ছিল না। কিন্তু কিউবার তুলনায় উন্নত বলে 'চে' বিশেষ উৎসাহ নিয়ে সর্বত্র ঘুরে দেখেন। তিনি নিজেও কতকগুলি ছবি তোলেন। পথে ঘাটে গবাদি পশু শুয়ে রয়েছে, এমন ছবিও তিনি তুলেছিলেন। দ্বিতীয়বার পন্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, দিল্লির আশেপাশে তিনি অনেক গরু ঘুরতে দেখেছেন। এই গরুগুলির দুধ কেন সাধারণ শিশুরা পান করে না। শিশুদের অনেকের মধ্যে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। আর পন্ডিত নেহরু এক বিপ্লবীর এমন ধরনের প্রশ্নে বেশ বিব্রত হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে এমনি চে গ্যেভারাকে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বলে আখ্যায়িত করেননি। ভারতের মতো বহু দূরদেশে শিশুদের অপুষ্টি তাঁর হৃদয় চঞ্চল করেছিল। তিনি তার সমাধান খুঁজতে নিঃসঙ্কোচে দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই সটান প্রশ্ন করে সমাধান প্রার্থনা করেছিলেন।

৩ জুলাই 'চে' গ্যেভারা ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং এক প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ভি কে কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিবিধ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। তিনি ভারতের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ এস কে দে'র সঙ্গে দেখা করেন। সাধারণভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনে সদর্থক উন্নয়ন সম্ভব করার পথ সম্পর্কে 'চে' আলোচনা করেন। বিপ্লবী কিউবার প্রতিনিধিবৃন্দ ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ কানুনগো, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী এ পি জৈন এবং পরিকল্পনা কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাণিজ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'চে' এবং তাঁর সঙ্গীদের চা কফি এবং চুরুট উপহার দেওয়া হয়। 'চে' গ্যেভারা অতি উৎসাহে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘসময় ব্যয় করেন। এসবের আগেই তাঁরা ওখলা শিল্পতালুকে ঘুরে আসেন।

দিল্লিতে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে 'চে' অল ইন্ডিয়া রেডিওর সাংবাদিক শ্রীমতি কে পি ভানুমতীর সঙ্গে বেশ দীঘ এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বস্তুত ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হিন্দুস্থান টাইমস্ এ সহাস্য পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে 'চে'র একটি ছবি ছাপানো হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে পন্ডিত নেহরুর অতি ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা সম্পর্কিত বিষয়ে নেপাল থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বিশদে লেখা হয়েছিল। অনেক বছর পরে দৈনিক জনসত্তা পত্রিকার সম্পাদক খোঁজ খবর করে বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশ্যে এনেছিলেন। দেশের বামপন্থী দলগুলি বাস্তবে কিছুই জানতে পারে নি। পরিতাপের বিষয় হলেও এ এক কটু সত্য।

যতদূর জানা যায় 'চে' গ্যেভারা দিল্লি থেকে ট্রেনযোগে কানপুর যান। সেখানে চর্মশিল্প নিয়ে তাঁর উৎসাহ দেখান এবং ভিয়েতনাম যাবার আগে তিনি কলকাতায় আসেন। এই শহর এক কিংবদন্তী বিপ্লবীকে ন্যূনতম সম্মানও প্রদর্শন করতে পারেনি। কলকাতায় এসে তিনি আই এস আই (বরানগর) পৌঁছে বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ও গবেষকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আলোচনা করেন। ঘুরে দেখেন এই বিশিষ্ট শিক্ষালয়। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান মস্তিষ্ক ড. প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ সেই সময় আই এস আইতেই ছিলেন। 'চে' বরানগরের কাছেই আগরপাড়ার একটি ডেয়ারি ফার্ম দেখতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিশদ সংবাদ আমাদের জানা নেই। 'চে'র মতো হৃদয় উদ্বেল করা এক কিংবদন্তী বিপ্লবীর এমন অপরিচিতের মতো কলকাতা ভ্রমণ অবশ্যই আমাদের কাছে হৃদয় বিদারক। এখন আমরা কল্পনা করেও অধোবদন হই। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসকে পাল্টে ফেলার কোনও সুযোগ আর নেই। এমন সুযোগ হারালে তা আর ফিরে আসে না।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বৈরাচারী ও পঠন পাঠনের পরিবেশ ধ্বংসে সক্রিয়

কুখ্যাত আর এস এস-এর প্রচারকরা এখন প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য পদে বসে আছেন। এইসব প্রচারকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে এমন উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়নি। তাঁরা নির্দিষ্ট ভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার প্রসারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন। সবকটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হয়ে চলেছে। ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের এ তাবৎকাল যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ছিল তা প্রায় সবই খর্বিত বা লুণ্ঠিত। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার কোনও বালাই নেই। সর্বত্রই আর এস এস বা এই জঙ্গি সংগঠনটির অনুগত সংগঠনগুলির আখড়ায় পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলি।

ভারতের অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজীবন স্বপ্নের শিক্ষাঙ্গন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এখানে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের পরিবর্তে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটানোর কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এই বিশেষ ভাবাদর্শ সম্পর্কে সম্ভবত অজ্ঞ বা উদাসীন। তিনি প্রথম থেকেই কবিগুরুর ভাবাদর্শ বিরোধী পরিবেশ নির্মাণে বেশি উৎসাহী। সংঘাত চলছে অবিরত। অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্র ছাত্রীদের চরম শত্রুভাবাপন্ন প্রতিপক্ষ বলে মনে করেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কথায় কথায় শাস্তির খাঁড়া নামিয়ে আনেন ছাত্রদের ওপর। শিক্ষকরাও রেহাই পান না। অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যর মতো অঙ্কশাস্ত্রের প্রখ্যাত পন্ডিতের বিরুদ্ধেও অযাচিত শাস্তি বিধান করেছেন বর্তমান উপাচার্য।

ছাত্র ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, কথা বলার অধিকার পর্যন্ত ভুলুণ্ঠিত। মুক্ত চিন্তার কোনও সুযোগ আর থাকছে না। ছাত্রদের সংসদ গঠন করে পঠন পাঠনের সুস্থ পরিবেশ এবং রবীন্দ্র ভাবনার প্রসার এখন পুরোপুরি স্তব্ধ। এক স্বৈরাচারী উপাচার্য তাঁর খেয়ালখুশি অনুযায়ী, তাঁর আরাধ্য আর এস এস-এর ভাবাদর্শ মেনে চলতেই মাত্রাহীন উৎসাহ দেখাচ্ছেন। বিশ্বভারতীর স্বাভাবিক পরিবেশ কলুষিত। ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করছেন। বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান করেছেন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য বামফ্রন্টের সভায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, রাজ্য বামফ্রন্টের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে বোলপুরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।

গত ১৯ জুন দুপুর ২টার সময় বোলপুর রেল ময়দান থেকে বামফ্রন্টের সুসজ্জিত প্রতিবাদ মিছিল বিশ্বভারতী অভিমুখে চলতে শুরু করে। এই বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্য বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কম বিমান বসু, আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড়, সি পি আই-এর সম্পাদক কম. স্বপন ব্যানার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক কম. নরেন চ্যাটার্জী, সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য কম. রামচন্দ্র ডোম, আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহিলা নেত্রী কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ছাত্র নেতা কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা প্রমুখ।

মিছিল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর স্টেট ব্যাংকের সামনে প্রশস্ত চত্বরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বীরভূম জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সি পি আই (এম)-এর জেলা সম্পাদক কম. গৌতম ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কম. স্বপন ব্যানার্জী, কম. নরেন চ্যাটার্জী, কম রামচন্দ্র ডোম এবং কম. বিমান বসু। সভায় সমস্ত বক্তাই আর এস এস-এর বিপদ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য সরকার যেভাবে আর এস এসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার তীব্র সমালোচনা করেন সকল বক্তা। বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শ বিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছেন অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তার বিরুদ্ধেও বক্তাগণ সোচ্চার ছিলেন।

সভায় বর্তমান উপাচার্যকে দ্রুত অপসারিত করে বিশ্বভারতীর প্রকৃত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি তোলা হয়।

উপরাষ্ট্রপতি ধানকর বনাম সুপ্রিম কোর্ট

পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং উপরাষ্ট্রপতি পদে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন, পদাধিকার বলে আবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধানকর সম্প্রতি সর্বভারতীয় নির্বাচনী আধিকারিকদের (Presiding Officers) সম্মেলনে বিচার বিভাগের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা করে দেশবাসীকে ''সচেতন'' হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। NJAC Act এর (National Judicial Appointments Commission Act) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের তীব্র সমালোচনা করে ধানকর বলেছেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় সংসদের সার্বভৌমত্বের উপর নগ্ন আক্রমণ এবং জনাদেশের অসম্মান হচ্ছে। বিচার বিভাগের সঙ্গে সংসদীয় ব্যবস্থার এই সংঘাত এখন কোনও রাখঢাক না খোলাখুলিভাবেই শুরু হচ্ছে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার দাবি সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী বিচার বিভাগকে সাংবিধানিক ক্ষমতার পরিধির মধ্যেই কাজ করতে হবে (Separation of power mandated by constitution)। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিমত-বিচার বিভাগ যেন প্রশাসন এবং সংসদকে মান্যতা দিয়েই কাজ করে। (Judiciary should work in hermony with executive and legislation)। সংসদ ও প্রশাসনকে যথাযথ মান্যতা দিয়েই বিচার বিভাগকে কাজ করতে হবে।

প্রসঙ্গত প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও সর্বোচ্চ আদালতের ভূমিকার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ও তার সঙ্গীর সমালোচনা সেই পুরনো ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত উপরাষ্ট্রপতির এই ভূমিকায় মনে হয় সচেতন ভাবেই বিশেষ উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক গকণতন্ত্রের এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সংঘাত বাধানোর অপচেষ্টা চলেছে এবং এইভাবেই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর অন্তর্ঘাতের চেষ্টা শুরু হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে ''মহাক্ষিপ্ত'' ধানকর প্রশ্ন তুলেছেন ভারত কি সত্যিই এক গণতান্ত্রিক দেশ। এমন কুমীরের কান্না সত্যিই হাস্যকর।

বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে এমন মনে হতেই পারে যে, দেশের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকেই মুখ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যে বন্দী না হয়ে দেশবাসীকে সংবিধান এবং বিচার বিভাগের মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বহু দেশেই জনগণের এমন উদ্যোগ শুরু হয়েছে, ভারতই বা কেন এই উদ্যোগে সামিল হবে না।

পেনশনার্স এসোসিয়েশনের সম্মেলন

জানুয়ারি ২২ তারিখে জয়েন্ট কাউন্সিল অনুমোদিত ''সারা বাংলা গভঃ পেনসনার্স এসোসিয়েশন'' -এর ৪র্থ রাজ্য সম্মেলনে কম. ক্ষিতি গোস্বামী নগর (কোলকাতা) এবং কম. মেঘনাদ সাহা মঞ্চ ১২৪সি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জয়েন্ট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কম. অসিত সরকার। সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রমজীবী মানুষের নেতা কম. তপন হোড় সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক আন্দোলন আক্রান্ত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের দাবি দাওয়া চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থায় সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে নিজ নিজ স্তরে ও ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে সমাজ বদলানোর আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনা করেন কম. তাপস গোস্বামী, কম. পত্রলেখা নন্দী ও কম. সুখেন্দু ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনের ১৫টি জেলা থেকে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। প্রতিনিধিদের মধ্যে ২১ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাবের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে আগামী তিন বছরের জন্য কম. শান্তনু মুখার্জীকে সভাপতি ও কম. নির্মল সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয় ও ১৫ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। বর্তমান সময়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বঞ্চনা নিরিখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও মজবুত করে লড়াই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করে গণ আন্দোলন জোরদার করতে বিশেষ উদ্যোগ নেবার কথা ঠিক হয়।

ড. মেঘনাদ সাহা ও তরুণতীর্থ

ড. মেঘনাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত শিশু ও কিশোর সংস্থা তরুণতীর্থের বার্ষিক শিক্ষা শিবির মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল দঃ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীর চম্পা মহিলা সোসাইটি প্রাঙ্গনে। শিবিরটি চলে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে বিশেষ করে, সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে তিনশ ভাইবোন এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। ব্যান্ডের তালে ও সংঘ ত্যাগ সত্যের শ্লোগানে তরুণতীর্থের পতাকা উত্তোলন করে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন তরুণতীর্থের রাজ্য সভাপতি অমল নায়েক। পতাকা উত্তোলনের পর ভাইবোনদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। আজকের শিশু ও কিশোরদের আগামী দিনে সুনাগরিক করে গড়ে তোলাই এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। তিনদিনের এই শিবিরে বিভিন্ন গ্রুপে ভাইবোনেদের প্যারেড, পিটি, ড্রিল, ব্রতচারী, লোকনৃত্য, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতি শেখানো হয়। ক্যাম্পের বিভিন্ন দিনে ভাইবোনেদের দ্বারা সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ক্যাম্প চলাকালীন অসহায় দুঃস্থ মানুষদের জন্য মশারি ও কম্বল বিতরণ করা হয়। এই শিবির এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। সুন্দরবন নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ষাট জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্যাম্পের বিভিন্ন দিনে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, চন্দ্রশেখর দেবনাথ, হরিপদ বৈদ্য, প্রভদান হালদার উপস্থিত থেকেছেন।

কমরেড জয়ন্ত বিশ্বাস স্মরণে

প্রয়াত নওদার প্রাক্তন বিধায়ক ও আর এস পি'র অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কম. জয়ন্ত বিশ্বাস-এর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নওদা ব্লক পি এস ইউ-র উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধেয় নেতা স্মরণ অনুষ্ঠান সংগঠিত হল। সকাল দশটায় প্রথমে জয়ন্ত বিশ্বাস এর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শুরু হয়। উক্ত শিবিরে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। এভাবেই দিনটিকে সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পার্টির সম্পাদক কম. অঞ্জনাভ দত্ত ও পি এস ইউ এর রাজ্য সম্পাদক কৌশিক ভৌমিক, রাজ্য সভাপতি হাবিবুর রহমান (সোহেল), নওদা ব্লক সম্পাদক রুবেল শেখ এবং স্থানীয় পার্টির নেতৃত্বও এই মহতী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

ইজরায়েলে গণ বিক্ষোভের বিস্ফোরণ

জানুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে ইজরায়েলের বড় বড় শহরগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিচার বিভাগের সংস্কারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইজরায়েলের মানুষদের অভিযোগ— প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবমূল্যায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে একের পর এক গণতন্ত্র বিরোধী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইজরায়েলের পার্লামেন্টে ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী দলের নেতা নেতানিয়াহুর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লাগাতার ছ'বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের উপর আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর দাবি সরকারের তিনটি শাখার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই প্রশাসনকে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। এই ''মহান'' লক্ষ্যে তাঁর এই তথাকথিত সংস্কারের পরিকল্পনা। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক সরকারগুলি সরকারি জনস্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে পঙ্গু করে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য, বর্তমান ভারতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলও একই পথের পথিক।

যে উন্নয়নে ৯৯ শতাংশ মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকা দায়

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

ভারতে আর্থিক দিক থেকে ওপরে থাকা ১০ শতাংশ ধনী, দেশের মোট সম্পদের মধ্যে ৭২ শতাংশের মালিক। দেশে যে পরিমাণ সম্পদ বেড়েছে, তার ৬২ শতাংশের মালিক ১ শতাংশ ধনকুবের। পাশাপাশি আর্থিক দিক থেকে নিচে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষ, দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশের মালিক। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের অর্ধেক মানুষেরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে একেবারে দীন দরিদ্র মানুষের অবস্থা কেমন? উন্নয়ন ওপর থেকে নিচে চুঁইয়ে পড়ছে না। নিচের তলাকে রিক্ত করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেট কর্তা। সর্বশেষ অক্সফ্যামের রিপোর্টে উঠে এল চূড়ান্ত অসাম্যের এই চিত্র।

বছরের শুরুতে প্রকাশিত এই রিপোর্টের নাম, 'সারভাইভাল অফ দ্য রিচেস্ট'। উন্নয়নের ধাক্কায় সিংহভাগ মানুষের টিকে থাকা দায়। রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ পেটভরা পুষ্টিকর খাবার পান না। অপুষ্টিজনিত রোগে এই দেশে প্রতি বছর ১৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান। দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারের প্রকৃত আয় অতিমারির বছরে (২০২০-২১) কমেছে। অথচ, কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। অতিমারির দুই বছরে ভারতে বিলিওনারের (যাদের সম্পদ ১০০ কোটি ডলার বা তার থেকে বেশি) সংখ্যা ৬৪ জন বেড়ে হয়েছে ১৬৬ জন।

দেশে ১০০ জন ধনী ব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ভুললে চলবে না, ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৪০ লক্ষ কোটি টাকারও কম। প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ সব কা বিকাশের' অপূর্ব নমুনা! শুধুমাত্র আদানি কোম্পানির কর্ণধারের সম্পদ অতিমারি কালে বেড়েছে আট গুণ। আর ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো জানাচ্ছে, ২০২১ সালে দেশে প্রতিদিন গড়ে ১১৫ জন দিনমজুর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

আর্থিক এই অসাম্যের সঙ্গে, জাতি ও লিঙ্গগত বৈষম্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়। অক্সফ্যাম রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, মহিলা প্রধান পরিবারগুলির দারিদ্রের বিচারে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থাই সবচেয়ে করুণ। ভারতে প্রতি সাতটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার মহিলা প্রধান। দারিদ্রের হার এই পরিবারগুলির মধ্যেই তুলনামূলক ভাবে বেশি। পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির আইনি অধিকার মহিলাদের থাকলেও, কার্যত অনেকেই সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন। রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী ধূমধাম সহকারে পালিত হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর মহিলাদের অধিকার নিয়ে তিনি যখন সরব হন, তখন ইউরোপেও এই কথা বিশেষ শোনা যেত না। অথচ, এত বছর পরেও, তাঁর জন্মভূমিতেই অনেকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

রিপোর্ট অনুসারে, লিঙ্গভেদে মজুরি বৈষম্যের চিত্রটিও লজ্জাজনক। কর্মরত মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৯ শতাংশ নিয়মিত বেতন পান। পুরুষদের মধ্যে এই হার ৬০ শতাংশ। পুরুষ শ্রমিক ১১ টাকা রোজগার করলে, মহিলা শ্রমিক পান ৬৩ পয়সা। জাতিভেদেও এই বৈষম্য রয়েছে। উচ্চবর্ণের শ্রমিক যত মজুরি পান, দলিতরা পান তার ৫৫ শতাংশ মজুরি। শহর ও গ্রামের মধ্যেও আয়ের বৈষম্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক, শহরাঞ্চলের অর্ধেক আয় করেন। প্রতি বছর ঘটা করে দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। দেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র সমানাধিকারের কথা বলেছে। কর্পোরেট দাসানুদাস সরকার আজ কেবল সংবিধানের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাকেই বিপন্ন করছে না, গড়ে তুলছে চূড়ান্ত অসাম্যের এক দেশ।

অক্সফ্যাম অসাম্য কমাতে কর কাঠামোতে বড়সড় বদল আনার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রত্যক্ষ কর থেকে পরোক্ষ করের পরিমাণ কম হলে তাকে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা বলা হয়। পরোক্ষ কর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে দিতে হয়। স্বাভাবিক যুক্তি বলে, সম্পত্তিবানদের ওপর বেশি কর আরোপ করলে অসাম্য কমানো যায়। কিন্তু নয়া উদারনীতির দর্শন-এর ঠিক বিপরীত। তার যুক্তি, বিনিয়োগ বাড়াতে প্রত্যক্ষ কর কমানো দরকার।

বিনিয়োগ বাড়লে, কর্মসংস্থান হবে। আমজনতার সুদিন আসবে। ১৯৯১ সাল থেকে এই অপযুক্তি শোনা যাচ্ছে। এখানে কর্পোরেট কর কমানো হয়। করছাড়সহ নানা আর্থিক সুযোগ কর্পোরেটগুলিকে দেওয়া হয়। আমজনতার ভর্তুকি কমিয়ে ধনীদের ঘুরপথে ভর্তুকি দেওয়া হয়।

দ্রব্যমূল্য কমার অপযুক্তি দিয়ে দেশে জি এস টি চালু হয়েছিল। অতিমারির সুযোগে জি এস টি'র হার বাড়ানো হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য, জীবনদায়ী- ওষুধ কিছুই ছাড় পায় নি। এখন সরকার, জি এস টি আদায় বৃদ্ধি দেখিয়ে আর্থিক বিকাশের দাবি করছে। জি এস টি আসলে কারা দিচ্ছেন? রিপোর্ট বলছে, আদায় হওয়া জি এস টি'র ৬৪ শতাংশই দিয়েছেন ভারতের জনসংখ্যার নিচের তলার অর্ধেক মানুষ (অর্থাৎ, যারা মোট সম্পদের মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশের মালিক)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আমজনতার নাভিশ্বাস ওঠার বিনিময়ে সরকারের রাজস্ব বেড়েছে।

অতিমারির সময়েই সরকার আমজনতার ব্যবহার্য পণ্যে বিপুল পরিমাণে আয় বাড়িয়েছে। ২০২০-২১ সালে পেট্রোজাত পণ্যে অন্তঃশুল্ক থেকে আয় তার আগের বছর থেকে ৭৯ শতাংশ বেড়েছিল। অথচ, বিশ্ববাজারে তখন অপরিশোধিত তেলের দাম রেকর্ড হারে কমেছিল। অন্তঃশুল্কের হার বাড়িয়ে আমজনতার পকেট কেটেছে সরকার। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ আর্থিক বছরের মধ্যে পেট্রোলের অন্তঃশুল্ক বেড়েছে ১৯৪ শতাংশ। ডিজেলে বেড়েছে ৫১২ শতাংশ। অধিকাংশ রাজ্য সরকার ভ্যাট না কমিয়ে পেট্রোজাত পণ্য থেকে আয় বাড়িয়েছে। জি এস টি বাড়লেও রাজ্য সরকারগুলির আয় বাড়ে। এভাবেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে দুই সরকার।

পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ করে নানাবিধ ছাড় দিয়ে ধনকুবেরদের সম্পদ বাড়ানো হয়েছে। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে কর্পোরেট কর আগের বছর থেকে ১৮ শতাংশ কম আদায় হয়। আদায় হওয়া কর্পোরেট করের পরিমাণ ছিল ২০১৬-১৭ সালের থেকেও কম। কর্পোরেট কর কম আদায়ের কারণ, সরকারের নীতি। ২০১৯ সালে কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ করা হয়। নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে সেই হার মাত্র ১৫ শতাংশ। ২০২০-২১ আর্থিক বছরের কর ছাড়সহ কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে নানা ছাড় দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অক্সফ্যামের সর্বশেষ রিপোর্টের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাজেট দেখলেও এই চিত্রটি ধরা পড়ে। ২০২২-২৩ সালের বাজেটে সরকারের মোট আয়ের ৫৮ শতাংশ করের মাধ্যমে আসবে বলে ধরা হয়। তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি জি এস টি থেকে (১৬ শতাংশ)। কর্পোরেট কর থেকে ও জি এস টি থেকে সরকারের আদায় বেশি। পরোক্ষ কর কারা বেশি দেন? নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষ,ওপর তলায় থাকা ১০ শতাংশ মানুষের থেকে ছয় গুণ বেশি পরোক্ষ কর দেন।

গরিব মানুষের নিত্যদিনের খাবার জোটাতেই আয়ের বড় অংশ চলে যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য উল্লেখ করে অক্সফ্যাম রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, ভারতের আর্থিকভাবে নিচুতলায় থাকা ২৫ শতাংশ মানুষের খাবার জোটাতে আয়ের ৫৩ শতাংশ চলে যায়। আর খাবারের জন্য ২৫ শতাংশ ধনীর খরচ হয় আয়ের ১২ শতাংশেরও কম। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবায় খরচ কমাতে গরিব মানুষ বাধ্য। অথচ, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থার খরচও ভয়াবহ গতিতে বাড়ছে।

অক্সফ্যামের হিসেব, ভারতীয় বিলিওনারদের সম্পদের ওপর ৩ শতাংশ কর নিলেই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আগামী পাঁচ বছরের খরচ উঠে যাবে। তাদের থেকে ২ শতাংশ কর নিলে সরকারের ৪২ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় হবে। যা দিয়ে দেশের অপুষ্টিজনিত কারণে রোগগ্রস্ত মানুষদের তিন বছরের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার প্রকল্পে অর্থ সংস্থান করা যাবে। দেশের ধনীতম ১০ জনের থেকে ৪ শতাংশ সম্পদ কর নিলে, সর্বশিক্ষা মিশনে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা যাবে। ধনকুবেরদের সম্পদ কর নিয়ে পরোক্ষ কর কমানোর মাধ্যমেই অসাম্য কমানো যাবে বলে অক্সফ্যামের অভিমত।

শুধুমাত্র ভারতেই নয়। অসাম্যের এই চিত্র সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ২০২০ সাল থেকে যত সম্পদ বেড়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছে ১ শতাংশ ধনকুবের। বিশ্বের বিলিওনারদের প্রতিদিন গড়ে সম্পদ বাড়ছে ২৭০ কোটি ডলার। পাশাপাশি ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম বিশ্বে দরিদ্র মানুষদের সংখ্যা বেড়েছে। ৮০ হাজার কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত। নিরন্ন মানুষের জীবনযন্ত্রণায় বিপর্যস্ত।

অসাম্যের প্রেক্ষাপটে কর কাঠামো বদলে সম্পদ করের নিদান অনেকেই এখন দিচ্ছেন। আসলে কর নীতি রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেই নীতি আবার এখন দুনিয়ার কর্পোরেট দানব এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই এম এফের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে বিনিয়োগ বা প্রকৃত কর্মসংস্থান কত হয় তার হিসেব মেলে না। নতুন বিনিয়োগের বিনিময়ে কত মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হচ্ছেন, জীবিকা হারাচ্ছেন, তার হিসেবও করা হয় না। নয়া উদারনীতিতে বিকাশের মানে হচ্ছে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের বিনাশ। লগ্নি পুঁজি, ফাটকা কারবার, জুয়াচুরির মধ্য দিয়ে ক্রমস্ফীত হয়। ঋণ নির্ভর অর্থনীতি ভোগবাদী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করার পাশাপাশি গরিব, নিম্নবিত্তকে দেনার জালে জড়ায়। ক্রয় ক্ষমতার বাইরে গিয়েও পণ্য কেনার সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত সঙ্কট ডেকে আনে। ২০০৭-০৮ সালের মার্কিন দেশ থেকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী মন্দা যার প্রমাণ। সেই সঙ্কট থেকে বাঁচতে প্রাণঘাতী বিষকেই ওষুধ মনে করা হচ্ছে। তাই আজ আবার নতুন করে সাংঘাতিক আর্থিক মন্দার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কর্পোরেট দুনিয়াকে আরও সুযোগ করে দিতে আমজনতার আর্থিক সঙ্কট বাড়ানো হচ্ছে।

পরোক্ষ করই কেবল বাড়ছে না। কর্পোরেট দুনিয়ার কর ফাঁকি দেওয়ার নানা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। যে দেশে ১০০ জন ধনকুবেরের সম্পদ সরকারের বাজেট বরাদ্দের থেকে বেশি, সেদেশে ধনকুবেররাই সব কিছু পরিচালনা করে। কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে। এই চিত্র বিশ্বব্যাপী। ২০২০ সালের একটি তথ্য অনুসারে দশটি বহুজাতিক কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ, মাত্র দুটি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন) ছাড়া অন্যান্য দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপি'র বেশি। অর্থাৎ, এই কোম্পানিগুলির মোট সম্পদকে জিডিপি ধরলে, সেটি বিশ্বের তৃতীয় ধনী দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়। বিপুল সম্পদের অধিকারী কর্পোরেট সংস্থাগুলিই আজ সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছে। নির্বাচিত সরকার বশংবদ না হলে, ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রও আজ প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণাধীন। এদেশে নির্বাচনী বন্ড যার বড় প্রমাণ। কর্পোরেট আগ্রাসনের প্রতিরোধ হলেই রাষ্ট্র আজ হিংস্র। দেশের মানুষের করের অর্থে চলা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী, দেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করছে। কর কাঠামোর সংস্কার অসাম্য কিছুটা কমাতে পারে, কিন্তু দূর করতে পারে না। ন্যায়ও আনতে পারে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটাই চূড়ান্ত অনৈতিক, অমানবিক। যেখানে শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যে দখলদারি নিশ্চিত করে মুনাফা হয়। শ্রমশক্তির দাম যত কম হবে, তত মুনাফা বাড়বে। তাকে আড়াল করতে, জিডিপি বৃদ্ধির হার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি দেখিয়ে আর্থিক বিকাশের কথা বলা হয়।

অথচ, রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতে আর্থিক ভাবে নিচে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষ পেয়েছেন জাতীয় আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ। অনেকে অসাম্য বৃদ্ধিকে আর্থিক সমৃদ্ধির নির্দেশক বলেন। তাতে নাকি অসাম্য বাড়লেও, গরিব মানুষের অবশেষে উন্নতি হয়। তার আয় বাড়লেও, ধনীর আয় আরও বেশিগুণ বাড়ায় নাকি অসাম্য বাড়ে। এই অপযুক্তি দিয়ে শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য লুঠের সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। এটাই কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অধোগতিশীল কর কাঠামো যার অঙ্গ মাত্র। আজকের আর্থিক মন্দার সময়ে এই উৎপাদন ব্যবস্থা আমূল বদলই অসাম্য দূর করার একমাত্র পথ।

অশান্ত ইরান

বিক্ষোভের আগুনে ইরান উত্তাল। হিজাব বিরোধী আন্দোলনের ৪ সমর্থককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সম্প্রতি আরও দু'জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান সরকার। ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জও তেহরান সরকারের সমালোচনা করেছে। অশান্তিতে উস্কানি দেওয়ার জন্য ইরান সরকার আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলির দিকে আঙুল তুলেছে। কট্টর মৌলবাদী ইরান সরকারের বিরুদ্ধে নানাস্তরের সচেতন মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল।

গুজরাটে শ্রমজীবী মানুষের জীবন বিপর্যস্ত

‘ভাইব্রান্ট’ গুজরাটে প্রতিদিন অন্তত ৯ জন দিনমজুর আত্মঘাতী হচ্ছেন। গত পাঁচ বছরের তথ্য তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। সংসদে তাঁর দেওয়া হিসাবে, পাঁচ বছরে এই আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৫০.৪৪ শতাংশ। শিল্পোন্নত গুজরাটে দিনমজুরদের এই ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার ঘটনায় অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এরাজ্যের দিন মজুরির ন্যক্কারজনক হার এক্ষেত্রে একটা বিশেষ ব্যাপার। কারণ, গুজরাটে এই হার খুবই কম। তাই এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে টিকে থাকাটাই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষে কঠিন।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় তথ্য পেশ করে জানিয়েছেন নিত্যানন্দ রাই, গুজরাটে দিনমজুরদের আত্মহত্যার ঘটনা বছর বছর বেড়েই চলেছে। ২০১৭ সালে এমন আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ২,১৩১। মানে প্রতিদিন ৬ জন দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে আত্মহত্যায়। ২০১৮ সালে দিনমজুর আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৫২২-এ। এক বছরে এক লাফে ১৮.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি। তারপর এই বৃদ্ধির হারও বেড়েই চলেছে। ২০১৯-এ দিনমজুর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে ২,৬৪৯টি, ২০২০-তে ২,৭৫৪টি, ২০২১-এ ৩,২০৬।

এই প্রসঙ্গেই অর্থনীতিবিদ ইন্দিরা হিরওয়ের বক্তব্য, ‘ভারতের মধ্যে গুজরাটেই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হার ২৯৫.৯০ টাকা। কেরালায় এই হার ৮৩৭.৭০ টাকা, তামিলনাড়ুতে ৪৭৮.৬০ টাকা, জম্মু-কাশ্মীরে ৫১৯ টাকা, হিমাচল প্রদেশে ৪৬২ টাকা, এমনকি বিহারেও ৩২৮.৩০ টাকা। অথচ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো রাজ্যের তুলনায় গুজরাটে অসংগঠিত শ্রমিক অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন, ‘সরকার সম্প্রতি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর অংশের জন্য বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকায় বেঁধে দিয়েছে। এই মাপকাঠিতে, গুজরাটের সমস্ত আধা-দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিকই সরকারের বেঁধে দেওয়া দারিদ্র রেখার অনেক নিচে বসবাস করেন।’ নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিপুল পাণ্ডিয়ার কথায়, ‘গুজরাটে যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁরা মোটেই ভালো মানের কাজ পাচ্ছেন না। এখানে ৮৫ শতাংশই রয়েছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, কিন্তু সকলের স্থায়ী কাজ নেই।’

বাস্তবে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটের উন্নয়ন নিয়ে যে গল্পগাথা করে চলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গুজরাটের উন্নয়ন একান্তভাবেই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী। রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার অভাব লক্ষণীয়। মোদী সরকারের দাবিগুলি অলীক এবং বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

মানুষের জীবনে যৌথ যাপনের উদ্যোগ

লোকায়ত মাল্টিডাইমেনশনাল রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ২৩ জানুয়ারি খানাকুলে যৌথ যাপনের অনুশীলন নিয়ে মত বিনিময় সভায় উঠে এলো প্রান্তিক মানুষের জীবনজীবিকা সংক্রান্ত বহু অজানা দিক।

বিকল্প জনবাদী সংস্কৃতি, অর্থনীতি নিয়ে উঠে এল নানা মত। আগামীদিনে শুরু হবে ছোট ছোট পরিসরে তারই প্রয়োগ। যার প্রধান চালিকাশক্তি হবেন মহিলারা, সহভাগী হিসেবে পুরুষরাও থাকবেন অন্যান্য ভূমিকায়। পুরো প্রকল্পটিতে তথাকথিত ‘‘রিগোরাস রিসার্চ মেথডোলজি’’ অনুসরণ করা হবে, কিন্তু সেখানেই সীমিত থাকবে না এর ব্যাপ্তি। মাটি থেকে উঠে আসা প্রস্তাবসমূহ সমান, বা ক্ষেত্রবিশেষে বেশি গুরুত্ব পাবে তথাকথিত সোশ্যাল সায়েন্সের পেডাগগিতে দিগ্‌গজ ব্যক্তিদের ‘‘ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া মতামতের’’ থেকে। জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ হলো তথাকথিত ‘‘মেরিটোক্রেসি’’ নামক আদ্যন্ত সুবিধাপ্রাপ্ত সামাজিক চুক্তির ওপর কুঠারাঘাতের অব্যর্থ অস্ত্র। সেই ভাবনা থেকেই লোকায়তের পথ চলা শুরু। সংগঠকরা আশা রাখেন আগামীদিনে এরকম আরো অজস্র উদ্যোগ গড়ে উঠবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে।

শুধুমাত্র নির্বাচনে লড়ে কিন্তু ফ্যাসিবাদকে হারানো যাবে না বলে মতপ্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীরা। গণমানুষের চেতনার স্তর আদ্যন্ত রাজনৈতিক, কিন্তু তাকে ক্রমাগত বিপথগামী করে চলেছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাসত্ব। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পিছনে অবশ্যই বস্তুবাদী যুক্তিসমূহ রয়েছে। কিন্তু সেটাকেই মোক্ষজ্ঞানে আঁকড়ে ধরলে আসল গন্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অতএব, গণআন্দোলন আর নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার মধ্যেই রয়েছে আগামীর সাফল্যের চাবিকাঠি।

জুট মিলের শ্রমিক সম্মেলন

গত ২০ জানুয়ারী ইউটিইউসি’র রেজিস্ট্রিকৃত বাঁশবেড়িয়ার গ্যাঞ্জেস জুট মিলের দুটি শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জুট মিলের ইউনিয়ন অফিসের এই দুটি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি’র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কম. দীপক সাহা সহ হুগলি জেলার নেতৃবৃন্দ কম. সত্যজিত দাশগুপ্ত এবং কম. অরুণ দাস। সম্মেলনে উপস্থিত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধিবৃন্দ মালিক পক্ষ এবং রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। ডিএ, স্থায়ীকরণ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি পেনশন প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান শ্রমিক প্রতিনিধিরা এবং নেতৃবৃন্দ। প্রথম শাখায় কম. দীপক সাহা সভাপতি, কম. সত্যজিত দাশগুপ্ত সহ সভাপতি, এবং কম. শঙ্কর দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় শাখার সভাপতিও কম. দীপক সাহা এবং অরুণ দাস সহ সভাপতি, সম্পাদক হিসেবে জিতেন সাহু নির্বাচিত হন।

কম. মিহির সেনগুপ্তর স্মরণসভা

কিশোর ভারতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ মিহির সেনগুপ্তের প্রয়াণে ১৪ জানুয়ারি কিশোর ভারতী পুরাতনী সংসদ আয়োজিত এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় দমদমের সুরের মাঠ সংলগ্ন সহস্রাধিক আসনবিশিষ্ট রবীন্দ্র ভবনে। কানায় কানায় পরিপূর্ণ এই কক্ষে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও বিশিষ্ট সুধীজন সকলেই ফুলে-মালায়, গানে গানে শ্রদ্ধা জানান তাঁদের প্রিয় মাস্টারমশাইকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী স্বপ্না দেব, অধ্যাপক অভ্র ঘোষ, অধ্যাপক তুষার চক্রবর্তী, কানাই সেন, অধ্যাপক কুন্তল মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। পাঁচের দশকে ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও চারিত্রিক গঠনের লক্ষ্যে শুরু হয় মিহির সেনগুপ্তের দীর্ঘসময়ের পথচলা। পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে মিহির সেনগুপ্তের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র চেতনাকে ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন মিহির সেগুপ্ত। এই উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্র ভাবনায় কিশোর ভারতী বিদ্যালয়, যা বর্তমানে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। তিনি রবীন্দ্র সংগীত খুব ভালোবাসতেন। তাই তাঁর স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়েই সমগ্র অনুষ্ঠানে তারা তাদের ভালোবাসা ও প্রণতি জানায়।

কলকাতায় ‘চে’ দুহিতা ডা. এলাইদা

ডা. এলাইদা গ্যেভারা ও এস্তেফেনিয়া

ডা. এলাইদা গ্যেভারা এবং তাঁর কন্যা এস্তেফেনিয়া মাচিন গ্যেভারা কলকাতায় ঘুরে গেলেন। এ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডা. আর্নেস্টে ‘চে’ গ্যেভারার কন্যা ডা. এলাইদা দ্বিতীয় বারের জন্য কলকাতায় এলেন। গত ২০ এবং ২১ জানুয়ারি বহু সহস্র উৎসাহী মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। এদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ তরুণী। এর আগে ১৯৯৭ সালে ‘চে’ দুহিতা কলকাতায় এসেছিলেন। এবার এলেন তাঁর কন্যা অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপিকা এস্তেফেনিয়াকে সঙ্গে করে।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের প্রথমদিকে কমরেড গ্যেভারা দিল্লি থেকে কানপুর হয়ে এই শহরে এসেছিলেন। সেই সময় তিনি কিউবার ঐতিহাসিক বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা। কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর সহযোদ্ধা। অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিপ্লবে পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক পথে নতুন কিউবা গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান কারিগর ‘চে’। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন বস্তুত ‘ইনকগ্‌নিটো’ বা অপরিচিত হিসেবেই। তাঁকে অভর্থনা জানানোর জন্য বামপন্থী নেতা কর্মীদের কোনও ভূমিকাই ছিল না। ‘চে’ স্বল্পসময় কলকাতা বাস কালে আগরপাড়ায় একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ সংস্থায় ঘুরে দেখেছিলেন। তারপর বরানগরের বিখ্যাত স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে নির্বাচিত কয়েকজন অধ্যাপক গবেষকদের সঙ্গে নিবিড় আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

এবার তাঁর কন্যা ডা. এলাইদা এবং দৌহিত্রী এস্তেফেনিয়া ‘চে’র স্মৃতি বিজড়িত আই এস আই ভ্রমণ করেন। খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন ‘চে’ কোথায় কোন ঘরে বসেছিলেন। আলোচনায় কি কি বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। কে কে সেইসময় উপস্থিত ছিলেন ইত্যাদি। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে কিউবার দুই কন্যা পূর্ব নির্ধারিত গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

২০ জানুয়ারি দুপুরে কিংবদন্তী বিপ্লবী ‘চে’র আত্মজনদের দেখতে, তাঁদের সান্নিধ্য পেতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীনেতাদের উপচে পড়া ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চের গ্যালারিগুলি প্রাণচঞ্চল কলকাতার স্পর্শে উদ্বেল। এই গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সংগঠক সারা ভারত শান্তি ও সংহতি কমিটি। ‘চে’ দুহিতাকে মঞ্চে দেখে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ হর্ষধ্বনি করে তাঁদের স্বাগত জানায়। মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার বহু শিল্পী। এঁদের মধ্যে ছিলেন অর্ক মুখার্জী, দুর্নিবার সাহা, পূরবী মুখার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ডা. কমলেশ্বর মুখার্জী। বহু সংগঠনের পক্ষ থেকে ডা. এলাইদাকে বই এবং অন্যান্য স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম) এর রাজ্য সম্পাদক কম. মহঃ সেলিম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কম. সুজন চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং শান্তি ও সংহতি কমিটির সভাপতি ড. অশোকনাথ বসু, প্রাক্তন সহউপাচার্য ড. সিদ্ধার্থ দত্ত, আর এস পি’র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কলকাতা জেলার সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, আর ওয়াই এফ-এর রাজ্য সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষপর্বে সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ‘চে’ দুহিতা ডা. এলেইদা গ্যেভারা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, চে গ্যেভারা পরিধেয় বস্ত্রের ওপর ছাপানো ছবি নয়। তাঁর মতাদর্শকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। যেখানে অনাচার অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হতে হবে। কিউবার মানুষ ঐতিহাসিক বিপ্লবের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত মানুষ কিউবার পাশে রয়েছেন এবং ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

২১ জানুয়ারি সকালে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় গণসম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। উত্তরপাড়ার গণভবনে যথারীতি মানুষের ভিড়ে ঠাসা। ডা. এলাইদা এবং তাঁর কন্যাকে সমবেত মানুষরা হর্ষধ্বনি করে অভিবাদন জানান। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পথে বালির বিবেকানন্দ সেতুর পরেই বিশাল মিছিল সহকারে বিপ্লবী কিউবার দুই কন্যাকে সভাস্থলে নিয়ে আসা হয়।

এই সভায় আর এস পি’র হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত ডা. এলাইদার হাতে স্মারক তুলে দেন।

এর পরবর্তীকালে দুপুর দেড়টা নাগাদ কলেজ স্কোয়ার চত্বরে পশ্চিমবঙ্গের বাম ছাত্র-যুব আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিপুল সমাবেশের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার তরুণ তরুণী উপস্থিত ছিলেন। আর ওয়াই এফ সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার ‘চে’ দুহিতার হাতে স্মারক তুলে দেন।

ডা. এলাইদা এবং তাঁর কন্যা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও ভ্রমণ করেন। কেরল, তামিলনাড়ু, দিল্লি প্রভৃতি স্থানেও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

পুঁজিবাদের বিবর্তন : একুশ শতকের পুঁজিবাদ (১)

তুষার চক্রবর্তী

শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বই এখন এক অভূতপূর্ব ও চরম অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-বস্তুতান্ত্রিক সংকটের আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ ভারতে ও বিশ্বের অন্যত্র, যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের মধ্যেও পুঁজিবাদ, বিশেষত একচেটিয়া ব্যক্তিমালিকানার পুঁজি, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, বিকাশমান। এই পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি, একদিকে যেমন চরম অসাম্য ডেকে আনছে, অন্যদিকে হারিয়ে যাচ্ছে যাবতীয় সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ। ভারতে রাষ্ট্রাশ্রয়ী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রধান সহায়ক উপাদান। প্রাতিষ্ঠানিক মূলধারার রাজনীতি একদিকে যেমন পুঁজিবাদের প্রধান ইন্ধন, অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র সহায় সম্বলহীন অংশকে, এমনকি, শ্রমজীবী মানুষকে তা সামাজিক সুরক্ষার বদলে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করছে। আবার সেই ভিক্ষান্নের চুরি করা অংশ ভরিয়ে তুলছে শাসকদলের তহবিল, বাড়াচ্ছে তাদের নেতাদের বৈভব। দেশ ও রাজ্যজুড়ে তৈরি করছে নানা চেহারার রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত। ভারতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে পুঁজিবাদের বিকাশে যেভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে—তা সম্ভবত এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করছে। পুঁজিবাদী বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নকে দেখা যাবে না। শুধু ভারতে নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও দুনিয়ার কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রতিটি দেশেই আজ এমনটা ঘটছে।

পুঁজিবাদ তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা ও অমানবিক আচরণ সত্ত্বেও, নানা সংকটের মধ্য দিয়ে, কিভাবে ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, সমগ্র বিশ্বকেই নিয়ে আসছে হাতের মুঠোয়, তা বুঝে না নিতে পারলে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব। এই সার্বিক নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে আশার কোনো চিহ্ন যে একেবারেই নেই—তা অবশ্য নয়। যেমন, দুনিয়া জোড়া একের পর এক পরাজয়, পশ্চাদপসারণ ও প্রবল সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও এখনও মার্কসীয় দর্শন ও বামপন্থী রাজনীতিকে দুনিয়া থেকে মুছে দেওয়া যায়নি। সাম্যবাদের দর্শন ও রাজনীতিতে বিশ্বাস হারাননি অনেকেই। কার্যত বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রধান বিরোধী অবস্থানে এখনো রয়েছে মার্কসবাদী রাজনীতি ও দর্শন। পুঁজিবাদ যদিও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করে, তার জায়গায় ধর্ম, সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, ভাষাভিত্তিক, পরিচিতিনির্ভর রাজনীতি আশ্রিত (identity politics) দলগুলিকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করতে চাইছে। ফলে, আজকের পুঁজিবাদের প্রশ্রয়ে এই ধরনের দলগুলি সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠছে। যেমন এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থেকেও, দুনিয়ার দেশে দেশে নানা আন্দোলনের সামনের সারিতে বামপন্থী ও সমাজবাদী দলগুলি এখনো বিরাজ করছে। তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর তাদের নির্ভরতা ও সঠিক রাজনৈতিক দর্শনের গুণে। শুধু তাই নয়, বিপ্লবের পথে না হলেও দুনিয়ার অনেক দেশেই, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় সংসদীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা অস্থায়ীভাবে ও আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতায় আসছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত উন্নয়নশীল বিশ্ব ছাড়াও আরো নানা দেশে এমনটা ঘটেছে ও ঘটছে। এই সব দেশে বামপন্থীরা অবস্থা অনুযায়ী, অথবা পরিস্থিতির চাপে, ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদী রাজনীতির দর্শিত পথের বাইরে পা ফেলছেন। বর্তমানে এই সব উদ্যোগকে একুশ শতকের সমাজতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বামপন্থী বা সাম্যবাদীদের তরফ থেকে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে, বিপ্লব বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক স্তরে শাসন ক্ষমতা অর্জনের এই ধরনের উদ্যোগ যে অতীতেও নেওয়া হয়নি, বা এখনই প্রথম নেওয়া হচ্ছে, এমনটা অবশ্যই নয়। কিন্তু কিছু দিন আগেও, এই সব উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ সমর্থন বা অনুমোদনের বাইরে হলে, তাদের সরাসরি শোধনবাদ হিসেবে নিন্দা করা হতো। অনেক সময় এই ধরনের উদ্যোগকে পুঁজিবাদের চাইতেও বেশি ধিকৃত হতে হত। সেই অবস্থা ও অবস্থান দুটোই এখন বদলেছে। কিছু কিছু কট্টরপন্থী দল বাদ দিলে—অন্যরা আর এখন এই সব উদ্যোগকে তেমন নেতিবাচক চোখে দেখেন না। বরং মনে করেন, দুনিয়াজোড়া সমাজতন্ত্র নানা রূপ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, পতন অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়েই উঠে আসবে। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিবাচক বিচার বিশ্লেষণকেও একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের রাজনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এটা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিবর্তনের স্বীকৃতি। এই চর্চা ক্রমশ বাড়ছে।

কিন্তু, একটা বিরাট ঘাটতি বামপন্থীদের অনেকের মধ্যে এখনো অনেকটাই রয়ে গেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির বিবর্তন নিয়ে এই মহলে এখনো গভীর ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হয় না। একুশ শতকে দুনিয়ার পুঁজিবাদে প্রাপ্রসর রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী রূপ অষ্টাদশ, ঊনবিংশ তো বটেই, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের পুঁজিবাদের সঙ্গেও আজ অনেকাংশে মেলানো যায় না। বর্তমান পুঁজিবাদ আরো কুশলী, আরো প্রযুক্তি ভিত্তিক, আরো আগ্রাসী ও চতুর চরিত্র অর্জন করেছে। যার মধ্যে নানা নতুনত্ব আছে, পুঁজিবাদে আগে যা দেখা যেত না। অনেক বৈপরীত্য আছে যা, পুঁজিবাদে আগের আগের যুগে স্থান পায়নি। আজকের যুগে পুঁজিবাদ বিরোধী প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে, আন্দোলনের মাটিতে নেমে লড়বার সময় সেই পরিবর্তনকে না বুঝলে, স্বীকৃতি না দিলে, চলে না। তা হলে কার্যকরী হওয়া যায় না।

কিন্তু, তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদী রাজনীতি ও দর্শন চর্চায় পুঁজিবাদের এই সব নতুন নতুন রূপের বিচার বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ধ্রুপদী মার্কসবাদী সমালোচনা ও চিন্তার এমন অনেককিছু এখনো প্রচারে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করা হয়, যাদের প্রয়োজন আর নেই। আজকের পুঁজিবাদ যা থেকে সরে এসেছে। এ সব একজাতীয় মানসিক স্থবিরতার লক্ষণ।

উল্লেখিত মানসিক জড়ত্ব বা inertia দুভাবে আমাদের ক্ষতি করে। প্রথমত, সাবেকি বা ধ্রুপদী মার্কসবাদী চর্চা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তেমন মেলে না ও প্রাত্যহিক কাজে লাগে না। তরুণ বা নবীন কর্মীরা তাই সচরাচর মার্কসবাদী চিন্তা চর্চা এড়িয়ে যান। যে কারণে, রাজনৈতিক পাঠক্রমের গুরুত্ব কমতে কমতে প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে, রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে, নবীনেরা স্বতস্ফূর্ততার মুখাপেক্ষী হন। আন্দোলনে সঠিক সুচিন্তিত নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। আন্দোলন বিপ্লবী চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়। নীতির বিচ্যুতি ঘটে হামেশাই। আমরা তা দেখি, নিন্দা করি, কিন্তু সঠিক উপায় অবলম্বনের দিকে এগোই না।

চিন্তাচর্চার থেকে ব্যবহারিক বামপন্থী অনুশীলনী রাজনীতির দূরত্ব তাই অনেকখানি বেড়ে গেছে। একুশ শতকের সমাজতন্ত্রে যদি আমরা আগ্রহী হই—তাহলে, আগে একুশ শতকের পুঁজিবাদকে, তার নতুন ও বিবর্তিত চরিত্রকে ভালভাবে বুঝতে হবে। এই আলোচনা, তারই মুখবন্ধ।

(২)

পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা। যদিও পুঁজিবাদের চেহারা দুনিয়ার সব দেশে সমান নয়। দেশে দেশে পুঁজিবাদের বৈচিত্রের পেছনে যেমন একদিকে আছে শ্রেণির বিকাশ ও সংঘাতের প্রসঙ্গ এবং দেশে দেশে সমাজ সংস্কৃতির, বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ; তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থারই একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এই অসম বিকাশকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ আছে।

জায়মান পুঁজিবাদের অসম বা দুর্বল বিকাশ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে বিকশিত পুঁজিবাদী-শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়েই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব জয়ী হয়। ফলে, এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত ইউনিয়ন—স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার ক্ষেত্রেও বিপ্লব বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা ঘটেছিল কতকটা এমন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে। আবার, বিজয়কে ধরে রাখার জন্যে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও শ্রমিক সর্বহারার তাদের প্রতি ব্যক্ত সংহতি যেমন কাজে লেগেছিল তেমনি, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অসম বিকাশ কিম্বা অন্তর্দ্বন্দ্ব সবক্ষেত্রেই বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

কিন্তু, ভুললে চলবে না যে অসম বিকাশ বা যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা। পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক। যার ফলে, নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ঠেকাতে দুনিয়ার সবকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র একজোট হয়ে যুদ্ধ ও অবরোধের মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্রকে নিকেশ করতে চেয়েছিল। আর, সেই অবরোধ উপেক্ষা করে নতুন সেই রাষ্ট্র টিকে থাকতে ও উন্নতির পথে এগোতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক- সর্বহারাদের শক্তিতে নয়। তা সফল হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাকে কাজে লাগিয়ে। সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে থেকে যে সংহতির পরিচয় দিয়েছিলেন—ইতিহাসে সে রকম কোনো নিদর্শন তার আগে দেখা যায়নি। যার ফলে, শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রকাশ্য আক্রমণ করার বর্বর পথ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে পুঁজিবাদ ও দুনিয়ার পুঁজিপতিরা ঐক্যবদ্ধ বলেই সারা দুনিয়ার শ্রমিক-সর্বহারা একজোট না হলে তাকে পরাস্ত করতে, পর্যুদস্ত করতে পারবে না।

বর্তমান যুগে পুঁজিবাদ সমাজতান্ত্রিক পথের দিকে অগ্রসর রাষ্ট্রকে আগের মতো সরাসরি আক্রমণ করবার রাস্তা সচরাচর নেয় না। বিশেষত, যদি সেই রাষ্ট্রের বা সেই ক্ষমতাতন্ত্রের কোনো ত্রুটি থাকে, খামতি থাকে, তা হলে তারা সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সংক্রামক রোগাক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তির মতো ব্যবহার করে। ১৯৬০-১৯৮০র আনোয়ার হোজার আলবেনিয়া বা কিম ইল সুং এর আমল থেকে উত্তর কোরিয়া যার নিদর্শন। সমাজতন্ত্রের নামে এই ধরনের প্রবল স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেই কালিমা-লিপ্ত করে।

এ যুগে পুঁজিবাদ যেমন আন্তর্জাতিকভাবে আরো প্রসারিত তেমনি অতীতের যে কোনো যুগের চাইতে আরো বেশি সংঘবদ্ধ। অথচ, এই সংঘবদ্ধতা সহজে চোখে পড়ে না। পুঁজিবাদ-নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া প্রচার ও সংবাদমাধ্যমের একটি প্রধান ও নিরন্তর কাজ হলো পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিরোধিতা ইত্যাদি দিককে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো, এবং পুঁজিবাদের একচেটিয়া চরিত্রের মতো, বিশ্বব্যাপী সংঘবদ্ধতাকে যথাসম্ভব আড়াল করা। যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখা। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একটা সামগ্রিক আবহ তৈরী করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের নেকড়ের মতো দলবদ্ধ জান্তব চেহারাকে দেখতে দেয় না। পুঁজিবাদের স্বার্থে বাধানো লুঠপাট ও যুদ্ধের সময় যা প্রকট হয়ে যায়। যদিও, একটি 'উদ্দেশ্য' প্রচার করে শিকারটিকে দাগিয়ে দেওয়া হয়। যাকে বলা যায়— victim blaming। যে আক্রান্ত, তাকেই ছল ছুতো ও মিথ্যে দিয়ে আগেই দোষী বানিয়ে রাখে। যেমন ইরাক যুদ্ধের আগে সাদ্দাম ও ইরাককে করা হয়েছিল।

দুনিয়ার মজদুর এক হও, ও কমিউনিস্টদের কোনো দেশ নেই তা আন্তর্জাতিক—এই সব শ্লোগান ও বক্তব্যের মধ্যে পুঁজিবাদের-আন্তর্জাতিক চরিত্রের বিরোধিতা করার অত্যাবশ্যক সূত্রটি নিহিত আছে। এটি নিছক একটি আবেগ বা আদর্শ নয়, একটি সাম্যবাদী রণনীতিও বটে। কিন্তু, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার এই ব্যবহারিক দিকটি ক্রমশ ফিকে বা ঝাপসা হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মঞ্চের অবলুপ্তি যাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্তালিনের এই মঞ্চকে অপব্যবহার করার কুফল হিসেবেই তা ঘটেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে, জাতীয় পুঁজিবাদ ও একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাবার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ ও শ্রমিক সর্বহারার মূল দ্বন্দ্বকে লঘু করে দেখানো হয়েছে। চিনে নয়া গণতন্ত্রের নাম করে শ্রমিক, কৃষক ও জাতীয় পুঁজির সহযোগিতার যে সূত্র মাও সে তুং হাজির করেছিলেন তার ফলাফল, কয়েক দশক পরে, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেই একেবারে বেআব্রু হয়ে যায়। তীব্র সোভিয়েত বিরোধিতার নাম করে পুঁজিবাদী ক্ষমতার মূলকেন্দ্র আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীর রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে চিন।

আসলে, চিনের নয়া গণতন্ত্রের সর্ষের মধ্যেই পুঁজিবাদের ভূতকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ভূত বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেই প্রকাশ্যে এল। চিনের নয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিতে দিতেই, লাল পতাকা শোভিত নয়া-পুঁজিবাদী চেহারা নিল। অতঃপর, ইন্দোচীনের ভিয়েতনাম সহ বাকি ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও একে একে পুঁজিবাদের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা নিতে থাকে। পুঁজিবাদের এই বিজয়, সারা বিশ্বে একদিকে যেমন আর্থিক অসাম্যকে, গরিব বড়লোকের বিভেদকে চরমে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে এই গ্রহের বাস্তুতন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলছে। শ্রমজীবী মানুষ ও দারিদ্র-নিপীড়িত মানুষ যাতে কোনভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্যে, একুশ শতকের পুঁজিবাদ প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করবার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে হিংসা ও হানাহানি। ভালভাবে নজর রাখলে বুঝতে পারা যাবে যে, আজকের একুশ শতকের পুঁজিবাদ এই সব সংকটে যে বিহ্বল হয়েছে তা নয়। কেননা, এর অনেকটাই তাদের পরিকল্পিত, তাদের দ্বারা নির্মিত। পুঁজিবাদের শক্তির একটি দিক যেমন বিশ্বপুঁজির সংহতি, তেমনি আরেকটি দিক পুঁজিবাদের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও পরিবর্তন। এ লেখার পরবর্তী অংশে সে দিকেই দৃষ্টিপাত করব আমরা।

Vol. 70 Issue No. 23 শনিবার, ২৮ জানুয়ারী ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনই রাজ্যকে বাঁচাতে পারে

১-এর পাতার পর—

এমন লজ্জাজনক ঘটনা আর কোনদিন বিধানসভায় ঘটেনি।

অতীতে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেস দলের বহু বিবাদ বিসংবাদ বিতর্ক অবশ্যই হয়েছে। অনেক সময় কংগ্রেসী সরকারের চরম অত্যাচারে বহু বামপন্থী মানুষ আহত নিহত হয়েছেন। শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। অনেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা বিচারে কারাবাস করেছেন। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রখর সমালোচনা করা সত্ত্বেও বামপন্থীরা কোনোকালেই বিধানসভায় ভাঙচুর চালানোর কথা দূরতম কল্পনাতেও ভাবেননি।

যাই হোক, এখন মনে হয় সকলেই বোঝেন যে তৃণমূল দলটি আদ্যন্ত সমাজবিরোধী অধ্যুষিত এবং ষড়যন্ত্র নির্ভর। মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ দখল করার অল্পকাল পরেই বলতে শুরু করেছিলেন যে, অতীতে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জন্য কোনও কাজই করে নি। ঠিক যেমন ২০১৪ সালে দিল্লির মসনদ দখল করার পর নরেন্দ্র মোদি বলতে শুরু করেছেন এবং এখনও বলেন যে অতীতে কংগ্রেস দল দেশের জন্য কোনও কাজই করেনি। লক্ষ করলে বেশ লাগে যে, মোদী এবং মমতার কর্মপদ্ধতি এবং চারিত্র বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন। দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদই নেই। মনে হয় যেন এদের উভয়েই একই সূত্র থেকে নির্দেশ নিয়ে চলেন। সেই সূত্রটি যে, আন্তর্জাতিক স্তরের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ভারতের পুঁজিব্যবস্থা সমগ্রভাবেই বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বিকশিত এবং সংগঠিত। এদেশের পুঁজিবাদ এখন বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্গে অনেক বেশি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এটা দীর্ঘ প্রায় তিন দশকেরও বেশিকাল যাবৎ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার প্রাপ্তি। অতএব বিশ্বপুঁজিবাদী শৃংখলের সব ধরনের প্রয়োজন মেটাতে ভারতের পুঁজিব্যবস্থা বিশেষ নির্ভরযোগ্য দায়িত্ব পালনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রস্তুত। অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রেও ভারতের এখন বিশেষ ভূমিকা। বিশ্বব্যবস্থার ঘনীভূত সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে ভারত আপাতত অতি উৎসাহী ভূমিকায়। এদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রেও অতি দক্ষিণপন্থী এমনকি, স্বৈরাচারী ভূমিকা নিতে ভারতের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন।

এ বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন যে, বিশ্বপুঁজিবাদের এমন দীর্ঘস্থায়ী চরম সংকট অতীতে আর লক্ষ করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে ১৯২৯-৩৯ পর্যন্ত যে গভীর সংকট নির্মিত হয়েছিল, বর্তমান সংকট অপেক্ষাকৃতভাবে তার চাইতে অনেক বেশিগুণ ভীতিজনক।

ভারতের মতো জনবহুল দেশের বাজার এখন অতি লোভনীয়। এই বিশাল বাজারের ওপর কর্তৃত্ব বা আধিপত্য কায়েম করতে এদেশের রাজনীতিতে আরও বেশি বেশি কব্জা করার অপচেষ্টা বিশ্বপুঁজিবাদ করছে। ২০০৭-০৮ থেকে যে দীর্ঘ বহু বছর নানাভাবে চাপা দিয়ে রাখা সংকট চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, তা থেকে বাঁচতে এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক পরিবর্তন একান্ত জরুরি। বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এপ্রসঙ্গে বিশাল বড় বাধা। তাকে পর্যুদস্ত করে, হতমান করতে না পারলে ভারতের বাজারে পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন কঠিন। মমতা ব্যানার্জীর উত্থান সম্ভব করতে সে কারণেই বিশ্বপুঁজিবাদ উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এমন সন্দেহ আদৌ অমূলক নয় যে, ২০১১ সালে নীতি আদর্শহীন মমতা ব্যানার্জী বিপুল পরিমাণে অর্থ খরচ করার সুযোগ এমন সূত্রেই পেয়েছিলেন।

উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে

দীর্ঘ বারো বছর নিরঙ্কুশ আধিপত্যমূলক শাসন চালানোর পরে রাজ্যের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন গ্রামগ্রামান্তরে বা শহরে কী উন্নয়ন হয়েছে। 'দিদির দূত বা দূতীদের অবস্থা করুণ।' সমস্ত গ্রামেই তাঁরা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের সামিল। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত পঞ্চায়েতগুলি চরম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। অধিকাংশ গ্রামে পানীয় জলের জন্য হাহাকার। বিদ্যালয় শিক্ষার হাল হকিকৎ কহতব্য নয়। শিক্ষক আছেন ছাত্রছাত্রী নেই। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকলেও তাঁরা অযোগ্য। তৃণমূল নেতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকুরি পেয়েছেন। ইতোমধ্যেই অনেক এমন ধরনের শিক্ষকদের চাকুরি গেছে। হাইকোর্টের নির্দেশে।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যখন তখন অপার দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ে তখন, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এরাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পিত পথে ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল সরকার। বিদ্যালয় শিক্ষাকে বরবাদ করতে পারলে অনেক প্রজন্মকেই ভিখারিতে পরিণত করা সম্ভব। সেইসব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের প্রতি আর কোনও শ্রদ্ধা বা ভালবাসা প্রকাশ করবে না। শিক্ষা যে চেতনা আনে মানুষের মধ্যে তা বন্ধ করে দিতে পারলেই আত্মসম্মান বোধহীন এক জরদ্গব প্রজন্ম নির্মাণ করা সম্ভব। বর্তমান তৃণমূলী শাসনের এটাই প্রধান লক্ষ্য।

মনে পড়ে, ২০১১ সালে ক্ষমতা দখলের পর মাত্র ছ'মাস যেতে না যেতেই স্বয়ং মমতা ব্যানার্জী দাবি করেছিলেন যে অসাধারণ উন্নয়ন তাঁর সরকার সম্ভব করেছে। ৯৯ শতাংশ কাজ শেষ। বাকী ১ শতাংশ শুধু ফলো-আপ। এখন সকলেই বুঝতে পারছেন কি হয়েছে!

খেলা মেলা করবো না তো, কি শ্রাদ্ধ করবো?

পশ্চিমবঙ্গে কোনও সর্বজনীন সদর্থক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় মমতা ব্যানার্জীর কোনোকালেই ছিল না। বিগত, প্রায় বারো বছর সময়কালে তিনি বহু কোটি টাকা খরচ করে বেশ কয়েকটি 'বিনিয়োগ উৎসব' করেছেন। রাজ্যের সাধারণ মানুষের অর্থ অকাতরে খরচ করে কিছু শিল্পপতির মনোরঞ্জন করা সম্ভব হয়েছিল কিনা তা, বলা যায় না। তবে এই রাজ্যে যে, কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি তা, এখন আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার প্রসঙ্গ নেই। ইদানীং রাজ্য সরকার বিনিয়োগের কোনও প্রস্তাব না থাকায় যে সব জমি শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তা, সব বিক্রি করে রাজ্যে কোষাগারের ঘাটতি পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা শহরেরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ যেসব স্থানে রাজ্য সরকারের জমি ছিল তা সবই বিক্রির ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সব জমি বিক্রি করেও যে কোষাগারের ভীতিজনক ঘাটতি মেটানো যাবে তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। যেমন খুশি তেমন চলার প্রবণতায় মমতা ব্যানার্জীর সরকার মাত্রাহীন বা অঢেল ঋণ নিয়েছে।

বামফ্রন্টের আমল পর্যন্ত যতটুকু ঋণ ছিল, বিগত ১২ বছরে সেই ঋণের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুৎপাদক কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয় রাজ্যের পক্ষে বিষম বিপদ ডেকে এনেছে। বামপন্থীরা এ প্রসঙ্গে সাবধান করলে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্ধতভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন ''খেলা মেলা করবো না তো, কি শ্রাদ্ধ করবো; এখন যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো শ্রাদ্ধের খরচ জোটাতেও আবার ঋণ নিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, রাজ্য সরকার যে ঋণ নিয়েছে তার বেশিরভাগ বাজার থেকে অনেক বেশি সুদে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন তো রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আশঙ্কা, আগামীদিনে সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

রাজ্যের শাসকদলের শীর্ষস্থান থেকে সমস্ত স্তরের নেতা কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতি এবং লুঠের টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি তো চলছেই। পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তৃণমূলের কোন গোষ্ঠী কতটা লুণ্ঠনের নিশ্চিত সুযোগ পাবে তা নিয়ে গ্রামে গ্রামে খুনোখুনি চলতে শুরু করেছে।

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন দীর্ঘকাল যাবৎ দলদাসে অবনমিত। এখন যে স্তরের মারামারি শুরু হয়েছে তাতে, এমন দলদাসদের পক্ষে আর কোনও নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নেই। সমস্যা গভীরতর হচ্ছে। এই সব হানাহানির সঙ্গেই সাধারণ মানুষের জীবনেও নানা বিপত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। নারী সমাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের ঘটনা নিয়মিত বেড়েই চলেছে। রাজনীতিগতভাবে বিজেপি এসবের সুযোগে তাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যাকুল। তৃণমূল কংগ্রেসও বামপন্থীদের পরিবর্তে বিজেপির পুনরুত্থানই সম্ভব করতে বেশি উৎসাহী। এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলছে।

২৩শে জানুয়ারী কলকাতায় নেতাজীর জন্মদিনে দেশপ্রেম দিবস উদ্‌যাপন

রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩শে জানুয়ারী ২০২৩ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস দেশপ্রেম দিবস হিসাবে রাজ্যের সর্বত্র পালিত হয়।

কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে সকাল এগারোটায় মহাজাতি সদন থেকে কম. সেলিম, কম. সূর্যকান্ত মিশ্র, কম. মনোজ ভট্টাচার্য প্রমুখ বামপন্থী নেতৃত্বের নেতৃবৃন্দের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নেতাজী স্মৃতি বিজড়িত মহাজাতি সদন থেকে শুরু হয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পৌঁছায়। ওখানে ঠিক বেলা সওয়া বারোটায় নেতাজী মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। আর এস পি'র পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. দেবাশীষ মুখার্জী, কম. পুলক মৈত্র এবং কম. রবি দাস, কম. স্বপন মাইকাপ সহ রাজ্য কমিটির ও কলকাতা জেলা কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা মাল্যদান করেন।

মাল্যদান শেষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান কম. বিমান বসুর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কম. মহম্মদ সেলিম, কম. প্রবীর দেব, কম. নরেন চ্যাটার্জি, কম. মিহির বাইন সহ আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে নেতাজীর দেশপ্রেমের আদর্শ, ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ বিহারের র ামগড়ে পাশাপাশি মঞ্চে, আর এস পি এবং নেতাজীর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তাৎপর্য উল্লেখ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেও বিজেপি'র পক্ষ থেকে নেতাজীকে নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার তীব্র সমালোচনা করেন।

২৬শে জানুয়ারী কলকাতায় এন্টালি মার্কেটে রাজ্য বামফ্রন্টের উদ্যোগে ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

''ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক বছর পর দেশের প্রশাসন পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে নীতি স্থির করার লক্ষ্যে ড. বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান সভা গঠিত হয় এবং ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনার পর দেশ পরিচালনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সহ জাতি ধর্ম নিরপেক্ষভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার সম্বলিত ভারতীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে তা চালু হয়। দেশের মানুষের নানা অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার নিরিখে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সংবিধানে ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু বিভিন্ন সময় দেশের ধনিক বণিক শ্রেণি ও সংসদে তাদের প্রতিনিধিরা এই সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারগুলিকে পদদলিত করে শ্রমজীবী মানুষদের অতীব যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আর এস এস-এর মতো মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনের অঙ্গুলি হেলনে দেশকে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সংবিধানে বর্ণিত দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের রূপকে ধ্বংস করছে। সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করছেন। এসবের বিরুদ্ধেই আজ বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে, সংবিধান রক্ষার সংগ্রাম করতে হবে।''

আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য গত ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার এন্টালী মার্কেটে আয়োজিত সভায় উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। ঐ সভায় কম. বিমান বসুর সভাপতিত্বে অন্যান্য বামফ্রন্ট নেতৃত্ববৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

স্পেনে গণবিক্ষোভ

১৫ জানুয়ারী, রবিবার মাদ্রিদের রাস্তায় হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভে উত্তাল। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ধ্বংসের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মাদ্রিদের রাস্তায় হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাঁদের দাবি, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ধ্বংসের সরকারি ষড়যন্ত্র এক জঘন্য অপরাধ। এর প্রতিবাদে জনগণের ব্যাপকতম অংশকে আন্দোলনের রাস্তায় আসতেই হবে। প্রসঙ্গত ২০২০ সালে কোভিড সংক্রমণের সময় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছিল। বিক্ষোভে সামিল আন্দোলনকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ স্পেন সরকার বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে মদত দেওয়ার জন্যই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পরিকল্পিত ভাবে দুর্বল করা হচ্ছে। নয়া উদারনীতির আবহে বর্তমানে দুনিয়ার বহুদেশেই কম বেশি একই পরিস্থিতি বিদ্যমান।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-